পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

৫ম স্মারক বক্তৃতা—২০১৩

নিরঞ্জনার ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি

চতুর্থ সংঘরাজ অধ্যাপক ড. ভিক্ষু সত্যপাল

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

৫ম স্মারক বক্তৃতা—২০১৩

নিরঞ্জনার ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি

চতুর্থ সংঘরাজ, অধ্যাপক, ড. ভিক্ষু সত্যপাল

ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি

ও

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

নিরঞ্জনার ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি
পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। পঞ্চম স্মারক বক্তৃতা
বক্তা ঃ চতুর্থ সঙ্ঘরাজ, অধ্যাপক, ড. ভিক্ষু সত্যপাল
বিভাগীয় প্রধান, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ।
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি-১১০০০৭।

প্রকাশকাল ঃ ২৭শে জুলাই, ২০১৩ ইং

প্রকাশক ঃ ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন
৫০ টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী,
কোলকাতা-৭০০ ০১৫।
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

মুদ্রক ঃ
নিউ গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন,
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : ₹ ৫০

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মরণে

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ছিলেন বিংশ শতকে ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একজন বরেণ্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। বিদ্যায়-পাণ্ডিত্যে, জ্ঞান-গরিমায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মহাপুরুষ। তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শনে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম। শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধবচন অধ্যয়ন করে তিনি পালি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং স্বদেশে ফিরে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ থেকে ত্রিপিটক বিশারদ উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর মহামুনি পালি বিদ্যালয়, নালন্দা বিদ্যাভবন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। জৈন, বেদান্ত ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে সংগীতি সংগীতিকারকরূপে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মাধার মহাস্থবিরের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধ হয় তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে, বিভিন্ন পত্র -পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলিতে এবং নালন্দা পত্রিকার সম্পাদনায়। কথিত হয়েছে সরস সাবলীল বাংলা ভাষায় মূলানুগ অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। বাংলার সমসাময়িক বিদূষী মনীষীরা তাঁর অনুবাদিত ও স্বকীয় রচনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি মিলেছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত ড. বি. সি. লাহা স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে।

ভিক্ষুসংঘের নিকট তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সংঘরাজ এবং ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন সদ্‌গুণের সমাবেশে ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন পরমারাধ্য ধর্মগুরু।

তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে অমর রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি যার উদ্যোগে প্রতি বৎসর পালিত হয় ধর্মাধার জয়ন্তী উৎসব। পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণ যথাশীঘ্র সমাপ্ত করে শিক্ষা ও নানাবিধ কল্যাণকর্মে লিপ্ত থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল প্রথম সংঘরাজের শেষ আশ্রয়স্থল এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র। নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের প্রচেষ্টায় ২০০৯ সাল থেকে স্মারক বক্তৃতার প্রচলন করা হয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এ পর্যন্ত চারটি বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে। এবারের বক্তা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক সংঘরাজ ড. সত্যপাল মহাস্থবির। তিনি 'নিরঞ্জনার ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া
সভাপতি
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন
পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

কোলকাতা
২৭শে জুলাই, ২০১৩

অধ্যাপক, ড. সত্যপাল ভিক্ষু (মহাথেরো) মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

পৃথিবীতে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আছেন যাঁরা আপন গতিপথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন না। অধ্যাপক ড. সত্যপাল মহাথের হলেন তার জ্বলন্ত সাক্ষর। বিশাল পর্বতের পাদদেশের বাসিন্দারা যেমন সেই পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশের অনুধাবন করতে পারেনা আমারও ঠিক তদ্রুপ। কিংবা মহাসাগরের গভীরতা যেমন পরিমাপ করা যায় না ঠিক তদ্রুপ অধ্যাপক সত্যপাল মহাথেরো মহোদয়ের জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

অধ্যাপক সত্যপাল মহাথেরো মহোদয়ের কর্মজীবনে বহুমুখী কর্মধারার স্বাক্ষর। তাঁর জন্ম ০১.০৩.১৯৪৯ সালে। জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ী চা বাগানে। তাঁর গৃহী নাম ছিল সমীর রঞ্জন বড়ুয়া। পিতার নাম বিনোদ বিহারী বড়ুয়া, আর মাতার নাম যূথিকা রাণী বড়ুয়া।

এই নবজাতক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতামাতার অনুমতি নিয়ে অপার আনন্দে ১৯৬৭ সালে ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের মহোদয়ের নিকট প্রব্রজিত হন। পরের বছর ১৯৬৮ সালে ১২ই মে মহানন্দা উদকসীমায় মহাসমারোহে উপসম্পদা লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি শিলিগুড়িতে অধ্যয়নকালে বুদ্ধভারতী ভূবনমোহন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদকরূপে নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি কামেশ্বর সিংহ দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পালি আচারিয়া উপাধি সহ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। একই বছরে তিনি ১৯৭২ সালে মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৫ সালে মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হতে বৌদ্ধ দর্শনে এম.এ. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৮৪ সালে বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রখ্যাত অধ্যাপক মহেশ তিওয়ারীর অধীনে (Concept of Death in Early Buddhist Literature) কনচেপ্ট অফ্ ডেথ ইন্ আর্লি বুড্ডিস্ট লিট্যারেচার" উপর গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

ইতিপূর্বে তিনি ১৬ই জুলাই ১৯৮১ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগে প্রভাষক রূপে যোগদান করেন এবং ৫ই এপ্রিল ১৯৯৩ পর্যন্ত তিনি প্রভাষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৬ই এপ্রিল ১৯৯৩ হতে ৫ই এপ্রিল ২০০১ বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগে রিডার পদে বৃত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ হতে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০২ সাল হতে সালে তিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত। ৩রা মার্চ ২০০৭ হতে ২রা মার্চ ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি পুনরায় বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশ বিদেশের বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী তাঁর অধীনে গবেষণা অভিসন্ধর্ভ সম্পাদন করেছেন তার সংখ্যা প্রায় ১৫ জন। ১৯৯২ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত তার অধীনে এম.ফিল করেছেন ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী।

তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রভাষক, রিডার, বিভাগীয় প্রধান, ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানরূপে সুদীর্ঘ কাল দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা আমাদের বাঙালী বৌদ্ধদের কাছে কম গৌরবনীয় বিষয় নয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রিত হন।

তিনি ১৮টি কমিটি এবং বোর্ড সদস্য হিসেবে নিয়োজিত আছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ৩৫টি সংস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ইতিমধ্যে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও স্মরণিকা সম্পাদন করেছেন। ইংরেজী, বাংলা ও পালি ভাষায় তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ গুলো হল—(১) খুদ্দক পাঠো (ইংরেজি ও হিন্দি অনুবাদ), (২) কচ্চায়ন ন্যাসো (দেবনাগরি অক্ষরে সম্পাদিত), (৩) ধর্ম সংগ্রহ (ইংরেজী ও হিন্দি অনুবাদ), (৪) বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর, (৫) বৌদ্ধভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ, (৬) শরণ গ্রহণের পরম্পরা, (৭) জয়মঙ্গল অট্ঠগাথা সানুবাদ, (৮) পালি সাহিত্যে চন্দ্রকথা, (৯) বুদ্ধের ভাষা প্রভৃতি।

এছাড়া বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ হতে তাঁর সম্পাদনায় 'বুড্ডিষ্ট স্টাডিজ' জার্নাল প্রকাশিত হয়ে আসছে। তিনি ১১টি জার্নাল সম্পাদনা করেছেন। এবং তাঁর বিভাগীয় প্রধান রূপে দায়িত্ব পালনকালে পাঁচটি আন্তর্জাতিক সেমিনার কনফারেন্স সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী পালি ভাষায়, শতাধিক প্রবন্ধ দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর সম্পাদনায় বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশনের মুখপত্র 'ধম্মচক্কং' ১৯৯৩ সাল থেকে তিনি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৮১ সালে ভিক্ষু-পরিবাস স্মরণিকা প্রকাশিত হয় (ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৮২ সালে 'মৈত্রী' স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা মানুষের গুণমাহাত্ম্যের বর্হিপ্রকাশ ঘটায় ড. সত্যপাল মহাথেরোর কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রেও তা অন্যথা নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত ২৫৫০তম বুদ্ধজয়ন্তী মহোৎসব জাতীয় কমিটির (২০০৫) তিনি সদস্য মনোনিত হন। জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈশাখ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত অন্তর্রাষ্ট্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা প্রতিপালন করেন। এগুলি ছাড়াও তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বহু সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে স্বীয় প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এতদ্‌সঙ্গে উল্লেখ্য যে তিনি ১৯৭৯ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ হতে সুত্ত উপাধি

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং ১৯৭৫ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২০০৯ সালে বার্মা সরকার কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে পারদর্শী হিসেবে এবং পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'অগ্গমমহাপণ্ডিত' উপাধি লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে দু'জন মাত্র ভিক্ষু এই মহান গৌরবনীয় উপাধি লাভ করেন। প্রথমজন হলেন বাঙালী বৌদ্ধদের সব্যসাচী বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং আমাদের ড. সত্যপাল মহাস্থবির। অবশ্য আরেকজন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু এই উপাধি লাভ করেছিলেন তিনি হলেন অগ্গ মহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির। তাঁকে এই উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন তৎকালীন বৃটিশ সরকার ২০০৮ সালে তিনি ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সংঘরাজ পদে বৃত হন। সম্প্রতি তিনি থাইল্যান্ড মহাচুলালংকার মহাবিজ্জালয় হতে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি দিল্লিস্থ বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশনের সাধারণ সম্পাদক রূপেও তাঁর কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাঁর বহুলপ্রতিভা ও বর্ণচ্ছটা জীবনধারা আমাদের মুগ্ধ করে, আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করি।

সুমনপাল ভিক্ষু
বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

পণ্ডিত ধর্মাধার স্মরণে নৈবেদ্য

বিংশ শতকের প্রথমভাগ বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের এক গৌরবময় অধ্যায়। বাংলার এ গৌরবময় অধ্যায় বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের পরবর্তী শতবর্ষকে নানাভাবে নব জাগৃতির প্লাবণে উদ্ভাসিত করে এবং মানুষের ধর্মীয় ভাব ও চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে। কারণ বঙ্গীয় সমাজের এ অধ্যায়কে আলোকিত করে বাংলায় আবির্ভূত হন বহু কৃতি সন্তান এবং তাঁদের ত্যাগদীপ্ত কর্ম-প্রতিভায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানকে উত্তরোত্তর মহিমান্বিত করে তোলেন। আজ যাঁর স্মৃতিচারণের সৌভাগ্য আমার হয়েছে তিনি হলেন পণ্ডিত ধর্মাধার যিনি বিংশ শতকের সূচনা-লগ্নে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম একদিকে যেমন একটি যুগসন্ধিক্ষণের নব জাগৃতির সূচনা অপরদিকে তাঁর কর্মপরিধি বিস্তারের মধ্য দিয়ে পরবর্তী শতবর্ষে সমগ্র বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে তাঁর পদচারণা একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস। তাঁর স্মরণে আজ "নিরঞ্জনার ঐতিহ্য" শীর্ষক আলোচ্য বিষয়টি আলোচনা করার আগে তাঁর কর্ম-জীবন সম্পর্কীয় দু'য়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করি। তবে এরও আগে পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই আজ আমাকে আলোচক হিসেবে যোগ্য বিবেচনা করার জন্যে।

যে যুগসন্ধিক্ষণে পণ্ডিত ধর্মাধার আবির্ভূত হন তখন ছিল বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের এক অভূত পালাবাদলের যুগ। বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম পুনরুত্থানের এ পালাবদলের সময়কালে আরও কয়েকজন পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে অভয়তিষ্য মহাস্থবির (জলদী, বাঁশখালি), শীলালঙ্কার মহাস্থবির (নানুপুর, ফটিকছড়ি), জিনবংশ মহাস্থবির (ছিলনীয়া, ফটিকছড়ি) সুবোধিরত্ন মহাস্থবির (জলদী, বাঁশখালী), দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির (সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ), বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির (চেঁদিরপুনি, লোহাগাড়া), শান্তরক্ষিত মহাস্থবির (বীণাজুড়ি, রাউজান), শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (উনাইনপুরা, পটিয়া), আনন্দমিত্র মহাস্থবির (আধার মানিক, রাউজান), বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির (হোয়াড়াপাড়া, রাউজান), অতুলসেন মহাস্থবির (বড়হাতিয়া, সাতকানিয়া), সুগতবংশ মহাস্থবির (ঘাটচেক, রাঙ্গুনীয়া), শীলাচার শাস্ত্রী (পুঁটিবিলা), জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির (বড়ইগাঁও, লাকসাম), শান্তপদ মহাস্থবির (চেঁদিরপুনি, লোহাগাড়া), অনাগারিক মুনীন্দ্রজী (ঢেমশা, সাতকানিয়া) প্রমূখ মণীষীগণের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তাঁদের অনেকের সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় এবং নিকট সান্নিধ্য না ঘটলেও পণ্ডিত ধর্মাধারকে কাছ থেকে দেখা ও তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা অনুভব করার সুযোগ আমার ঘটে এবং আমার প্রব্রজ্যা জীবনে তাঁর নান্দনিক প্রভাব বহুগুণে প্রভাবিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অপর দু'জন পুণ্যপুরুষের নামও আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। সে'ই দু'টি নামের মধ্যে একটি পরমারাধ্য গুরুদেব বিদর্শনাচার্য রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির (ফতেনগর, রাউজান) এবং অপরটি অতুলসেন মহাস্থবির (বড়হাতিয়া, সাতকানিয়া)। এ দু'জন পুণ্যপুরুষের অনুপ্রেরণা ও সান্নিধ্যতায় ধন্য আমার প্রব্রজ্যা জীবন।

পণ্ডিত ধর্মাধার একটি অবিস্মরণীয় ও বহুশ্রুত পুণ্যময় নাম। ধর্মপুরের (চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানা) ধর্মাধার একটি অপূর্ব সংযোগের সূচনা ঘটে ১৯০১ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে। পিতা পণ্ডিত হরচন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা প্রাণেশ্বরী বড়ুয়ার প্রথম সন্তান ধর্মাধার সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে বিপিনচন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন বিপিনচন্দ্রের বয়স চৌদ্দ বছর। পিতার সাপ্তাহিক পুণ্য ক্রিয়া অনুষ্ঠানে বিপিনচন্দ্র ধর্মকথিক মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হন।

এর পরবর্তীকালে তিনি আব্দুল্লাহপুর শাক্য বিহার (ফটিকছড়ি), বীণাজুরী শ্মশান-বিহার (রাউজান), রাজানগর রাজবিহার (রাঙ্গুনীয়া), ভোজপুর বিহার (ফটিকছড়ি) ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন বিহারেও প্রব্রজ্যা জীবন অতিবাহিত করেন। উপরোক্ত বিহারগুলোতে তিনি শ্রামণ্য জীবনে ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, ধর্মকথিক মহাস্থবির, ধর্মরত্ন মহাস্থবির, আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির প্রমুখ স্বনামধন্য ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাস্থবিরগণের নিকট ব্যবহারিক শিক্ষা সহ ধর্ম-বিনয় শিক্ষা লাভ করে বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অবশেষে তিনি ১৯২২ সালের ১৬ই নভেম্বর আব্দুল্লাহপুর শাক্যমুনি বিহারের বদ্ধ ভিক্ষু-সীমায় তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ভিক্ষু-সঙ্ঘের উপস্থিতিতে দীক্ষাগুরু ধর্মকথিক মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা লাভ করেন। এবং আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের প্রস্তাবক্রমে ধর্মাধার ভিক্ষু নামে অভিহিত হন।

পাণ্ডিত্য অর্জনে তাঁর পিপাসু মন তাঁকে কোনদিন তৃপ্ত করতে পারেনি। তাই তিনি ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমুদ্র পাড়ি দেন সিংহলের উদ্দেশ্যে। তিনি সেখানকার পানাদুরা শহরে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সদ্ধর্মোদয় পালি পরিবেণে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ণ ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। উক্ত পরিবেশের মহাচার্য (অধিকরণ নায়ক-থের নামে খ্যাত) উপসেন মহানায়ক-থের'র তত্ত্বাবধানে তরুণ ও জ্ঞানপিপাসু ধর্মাধার বিনয়-পিটক ও তুলনামূলক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাছাড়াও তিনি উক্ত পরিবেণের দ্বিতীয় আচার্য বুদ্ধদত্ত থের'র নিকট বিশুদ্ধিমার্গ এবং পণ্ডিত জ্ঞানাভিবংশ ও ইন্দ্রগুপ্ত থের'র নিকট ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুদীর্ঘ পাঁচবছরকাল তিনি শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের নানা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। শ্রীলঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকালে তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন (বর্তমান বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ)-এর অধীনে পালি আদ্য-মধ্য-উপাধি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ত্রিপিটকের উপর নয়টি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে "ত্রিপিটক বিশারদ" উপাধিতে ভূষিত হন।

বিংশ শতকের বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে ধর্মাধার পণ্ডিত বা ভিক্ষু নামে খ্যাত একটি বহুশ্রুত নাম। এ অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রে সম্যক অধীত পারঙ্গম। বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় সর্বজন বিদিত। তদীয় গুরু আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির রচিত সত্যদর্শন গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি মেলে। তিনি ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন "আমি জানি, আমি না হয়ে আমার প্রিয় প্রধান শিষ্য তত্ত্বভূষণ, ত্রিপিটক বিশারদ ধর্মাধার যদি গ্রন্থখানি প্রণয়ণে ব্রতী হত, তাহলে গ্রন্থের গাম্ভীর্য আরো বেড়ে

যেতো"। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেখে দার্শনিক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া মন্তব্য করেন "মহাস্থবির ধর্মাধারের বহুমুখী প্রতিভা পেয়ে আমি বিমুগ্ধ, বাস্তবিকই তিনি একজন সত্যিকারের পণ্ডিত, তিনি যখন বঙ্গীয় সংস্কৃত বোর্ডের অধীনে পালি উপাধি পরীক্ষায় নির্বাণ সম্বন্ধে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। বস্তুত এরূপ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লেখা আমার পক্ষেও সম্ভব হত না।" তাঁর শতাধিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিত মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। তাঁর প্রবন্ধের একটি তালিকা বর্তমান পুস্তিকার পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, জ্ঞান-গরিমায়, তিনি ছিলেন ভারত উপমহাদেশের একজন অন্যতম বরেণ্য বৌদ্ধ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। তত্ত্ব ও তথ্য বহুল তাঁর বহু প্রবন্ধ এবং মিলিন্দ-প্রশ্ন, মধ্যমনিকায় (২য় খণ্ড), ধর্মপদ, শাসনবংশ, বৌদ্ধদর্শন ইত্যাদির অনুবাদ সহ সদ্ধর্মের পুনরুত্থান, অধিমাস বিনিশ্চয়, বুদ্ধ বন্দনা, বর্ষাবাস বিভ্রাট, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্বৎ সমাজে সমাদৃত হয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও পাণ্ডিত্যের প্রতি বিদ্বৎ সমাজের স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাঁদের কিছু মন্তব্য থেকে। এখানে তাঁদের দুয়েকটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মপদ গ্রন্থের ভূমিকায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবোধচন্দ্র সেন এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেন "বাংলা ভাষায় ধর্মপদের এমন সুপরিপাটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কিনা জানি না। মূল পালি পাঠের সঙ্গে বাংলা অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পণ্ডিত-অপণ্ডিত নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে।" বৌদ্ধ দর্শন শীর্ষক গ্রন্থটি মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের বিরচিত একটি উপাদেয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে পণ্ডিত ধর্মাধার তাঁর যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা ফুটে উঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কথায়। তিনি বলেন "এই জাতীয় গ্রন্থ অনুবাদের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। সৌভাগ্যের কথা, সেইরূপ একজন শাস্ত্রজ্ঞই এই অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন"। বাংলায় মধ্যম-নিকায় দ্বিতীয় খণ্ড পণ্ডিত ধর্মাধারের একটি অনবদ্য অনুবাদ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি অহিংসা ও আমিষাহার, অব্যাকৃত, অপৌরষেয়বাদ খণ্ডন, সর্বজ্ঞতার স্বরূপ, জাতিভেদের অনর্থ প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সহজ সরল ব্যাখ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় ফুটে উঠে। এতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ পায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত মহোদয় কর্তৃক লিখিত ভূমিকা থেকে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "ধর্মাধার ভিক্ষু এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের ও দশের বহু উপকার সাধন করিলেন এবং নিজেরও সাধনায় এক স্তর উপরে উঠিলেন"। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থ অনুবাদের জন্য অধ্যাপক সুকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন "এই অনুবাদের কৃতিত্ব কতখানি স্বীকৃত হয়েছে এবং গ্রন্থটি কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা প্রমাণিত হয় অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম প্রকাশনা নিঃশেষ হওয়ায়। বলা বাহুল্য, আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন, তাহলে গ্রন্থটি পাঠ করে খুশী হয়ে তিনি এর যথেষ্ট তারিফ করতেন

সে বিষয়ে সন্দেহে নেই''। এ মন্তব্যগুলো শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে তা নয় বরং পণ্ডিত সমাজে তাঁর সমাদর কতখানি উচ্চতর স্থান লাভ করে, তা বলাই বাহুল্য।

পণ্ডিত ধর্মাধার শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। ধর্ম ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার তাগিদ বোধ করে তাঁর নিরলস কর্মোদ্যম বহুগুণে প্রসারিত করেন। শ্রীলঙ্কার শিক্ষাজীবন হতে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি প্রথমে মহামুনি পালি কলেজে অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন এবং ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির (কড়ৈয়ানগর), অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী (পুঁটিবিলা), সুগতবংশ মহাস্থবির (ঘাটচেক), পূর্ণানন্দ মহাস্থবির (চেঁদিরপুনি), পূর্ণানন্দ মহাস্থবির (লাকসাম), পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির (বড়ইগাঁও), জিনরতন মহাস্থবির (চাঁন্দগাঁও) প্রমূখ প্রথিতযশা বহু বঙ্গীয় সন্তানকে ধর্মবিনয়-দর্শন শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলেন।

বলা বাহুল্য এ সময়ে পণ্ডিত ধর্মাধার খাগড়াছড়ি মং সার্কেল এর তদানিন্তন শাসক রাজা মংপ্রু সাইন কর্তৃক রাজগুরু পদে অভিষিক্ত হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ঐ পদে সমাসীন ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার (পূর্ববঙ্গ) প্রধান কর্মসচিবরূপেও দায়িত্ব প্রতিপালন করতেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কলিকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহার অধ্যক্ষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার তৎকালীন প্রধান সচিবের আবেদনক্রমে ভিক্ষু মহাসভা তাঁকে কলিকাতা প্রেরণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেন। এতদসঙ্গে উল্লেখ্য যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, নালন্দা বিদ্যাভবন (কলিকাতা)-এর অধ্যক্ষতার পদ অলংকৃত করে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস গ্রহণ করেন। বাংলার থেরবাদ বৌদ্ধধর্মকে এগিয়ে নেয়ার সংকল্পে তিনি বৌদ্ধশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিকভাবেও নিজেকে আজীবন সমর্পণ করেন। তাঁর বহুধা কর্মোদ্যমের পরিচয় মেলে সাংগঠনিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। অবিভক্ত বাংলায় তাঁর কর্মধারা কতখানি প্রসারিত ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ হল তিনি ছিলেন সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা ও চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সেবাসদন (বাংলাদেশ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের সম্পাদক, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ, ষষ্ঠসঙ্গীতিকারক, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সংঘরাজ প্রভৃতি। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের ১৮ই নভেম্বর বৌদ্ধ তীর্থরাজ বুদ্ধগয়ায় অনুষ্ঠিত ভিক্ষু-সঙ্ঘের এক মহতি সভায় ''ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'' গঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি মহাসভার প্রথম সংঘরাজ নির্বাচিত হন। তখন থেকে তিনি আজীবন এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর জীবনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ত্রৈমাসিক নালন্দা পত্রিকা। ১৯৬৬ সালে তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নালন্দা বিদ্যাভবনের তিনদশক পূর্তি উৎসব। তখন স্থির করা হয় এ উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু তিনি স্মারকগ্রন্থের পরিবর্তে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। এর ফলে স্মারক গ্রন্থের পরিবর্তে ত্রৈমাসিক নালন্দা পত্রিকার জন্ম হয়। এবং পরিচালন কমিটি তাঁকে সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে। এ পত্রিকার সাথে কলিকাতাস্থ বহু পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট ছিল।

বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, সমাজ-সংস্কার ও সাহিত্য-কর্মের আজীবন সাধক পণ্ডিত ধর্মাধারের জীবনকর্ম ও প্রতিভার মূল্যায়ণ করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তিনি জাতির জন্য যা দিয়েছেন, তার বিনিময়ে জীবনে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করেন নি। তবে এ ত্যাগদীপ্ত পুণ্যপুরুষ তাঁর কর্মপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক ''রাষ্ট্রপতি পুরস্কার'' এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক ''বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণপদক'' দ্বারা ভূষিত হন।

পাণ্ডিত্য, সাহিত্য-কর্ম ও সমাজ সেবায় আজীবন ব্রতী এ পুণ্যপুরুষের পদচারণা ভারত-বাংলা উপমহাদেশ অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধদেশের মাটি স্পর্শ করে। রাষ্ট্রীয় ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় বহু সভা সমিতি, সেমিনার, সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি তাঁর যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জীবনের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটে ১৯৭১ সালে। তখন থেকে তাঁকে নানাভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ হয় আমার। তাঁকে প্রথম দর্শনেই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব অনুভব করি।

পরবর্তীকালে যখন তিনি সঙ্ঘরাজ রূপে নির্বাচিত হন, তখন আমাকে মহাসভার সম্পাদক মনোনীত করা হয়। সে সুবাধে আমি তাঁর আরও গভীর সান্নিধ্য লাভ করি এবং তাঁর সামাজিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক প্রতিভা দেখে বিমুগ্ধ হই। তখন থেকে তাঁর জীবন-দর্শন সাঙ্ঘিক আদর্শ থেকে আমার সন্ন্যাস জীবনের বহু উপকরণ আহরণ করি। তাঁর জীবন দর্শন অনুধ্যান থেকে অনায়াসেই পরিস্ফুটিত হত যে তাঁর কোমল মনের করুণাঘন উদার চেতনা ও মহানুভবতার পরিচয়। তাঁর সাঙ্ঘিক জীবনের পরম নিষ্ঠতা ও বিনয়শীলতার পরিচয় অনুভব করি তাঁর চলা-বলা ও চিন্তন-মননে। তিনি ছিলেন অল্পভাষী, নিরুত্তাপ ও সদাপ্রসন্ন। তাঁর মৃদু ও মধুর ভাষণে সবাই মুগ্ধ ও মোহিত হয়ে পড়তেন অনায়াসে। সহিষ্ণুতা, ন্যায়-পরায়ণতা, অসীম সাহস, সত্যনিষ্ঠ ভাষণে, নির্ভীকতা, অধ্যাবসায় প্রভৃতি দেখেছি তাঁর জীবন চলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান-তপস্বী, মানবদরদী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমী, সরল ও আত্মনির্ভরশীল এ পুণ্যপুরুষ শুধুমাত্র বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধসঙ্ঘের একজন পরম হিতৈষী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও আদর্শ জীবনের মূর্ত প্রতীক।

স্মরণীয় যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে স্মৃতির পাতায় আবদ্ধ করে রাখার মানসে তাঁর নাম অলংকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ওগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি যুগে যুগে শুধু জীবন্ত হয়ে থাকবেন তা নয়, সমাজও নানাভাবে উপকৃত হবেন। তাই শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য যে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মাধার পালি কলেজে (শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ) বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে আমি কৃতার্থ হয়েছি। শুধু তা'ই নয়, ধর্মাধার বুদ্ধ বিহার (নাটাগড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ), ধর্মাধার লাইব্রেরী (নতুন দিল্লি), ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ) আদি প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় সেবা মূলক কার্যক্রম যতদিন চলতে থাকবে, ততদিন তিনি জীবন্ত থাকবেন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আজ আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'তেলকটাহ গাথা' নামক আমার ছাত্রজীবনে

অনূবাদিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে তিনি ধন্য করেন। এতদসঙ্গে তিনি আমাকে উৎসাহিত করতে গিয়ে লেখেন "এই কাজের জন্য অনূবাদক সত্যই ধন্যবাদার্হ হইলেন। স্নেহভাজন অনূবাদক সহজাত প্রতিভার অধিকারী। বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। মেধা ও অধ্যবসায় গুণে ছাত্র হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে দুই বিষয়ে স্নাতকোত্তর হইয়াছেন। এবার সূত্রপিটকের উপাধি পরীক্ষা দিবেন। তিনি নালন্দা বিদ্যাভবনের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিমগ্ন আছেন। অচীরে তিনি গবেষণা নিবন্ধ সমাপ্ত করিবে। বহু পত্র পত্রিকায় তাঁহার মনোরম প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার অনূদিত 'তেলকটাহ গাথা' মুদ্রিত হইল। আরও কয়েকটা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাঁহা হইতে আরও উপাদেয় গ্রন্থের প্রত্যাশা করা যায়। আমরা তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। আশাকরি এই অনুবাদ গ্রন্থ সুধীজনের সমাদর লাভ করিবে।" তাঁর এ আশীর্বাদ বাণী আমার জীবনে বহুলাংশে সফলতা এনে দিয়েছে।

ধর্ম, সমাজ ও জাতির উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার এবং বৌদ্ধ শিক্ষাবিস্তারে তাঁর জীবনকর্ম এ ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসেও তাঁর সমাজ ভাবনা ফুটে উঠেছে উত্তরবঙ্গের বিন্নাগুড়িতে ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত ভিক্ষু পরিবার উপলক্ষ্যে ২৪শে মার্চ ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার অধিবেশনে উপস্থাপিত তাঁর জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে। ঐ অভিভাষণটি 'বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু-সঙ্ঘের ভূমিকা' শিরোনামে নালন্দা অষ্টাদশ বর্ষে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত (১৯৮১) হয়। তাঁর সে অভিভাষণটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালে কলকাতার অনুষ্ঠিত ভিক্ষু পরিবাস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পরিবাস স্মরণিকায় আমি পুনঃ প্রকাশ করি। তার ঐ অভিভাষণে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ভিক্ষু-সংঘ ও গৃহী-সঙ্ঘের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বঙ্গীয় বৌদ্ধদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন—

"সর্বদা চারি প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া যে গৃহীরা উপকার করেন, ভিক্ষুরা তাঁহাদিগকে ধর্মদানের মাধ্যমে প্রত্যুপকার করিবেন। ভিক্ষুরা সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে দাতাদের সাহায্যে বিহার নির্মাণ করিবেন। তাহাতে গৃহীদের পূজা-উপাসনার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকিবে। ভিক্ষু ও গৃহীর মধ্যে প্রীতি-মধুর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোন স্বার্থ-সংঘর্ষ যাতে না ঘটে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। করুণাঘণ বুদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীর মধ্যে সংহতি স্থাপন করিয়াছেন "দ্বে মে ভিক্খবে চক্কানি সাসনস্স অভিবুদ্ধিয়া আন চক্কং চ ধম্ম চক্কং চ'। হে ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের সমৃদ্ধির জন্য দুই চক্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা হইল আদেশচক্র ও ধর্মচক্র। ধর্মচক্র পরিচালিত করিবেন ভিক্ষুরা আর আদেশচক্রের পরিচালনার ভার গৃহীদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই বুদ্ধের চেষ্টাতেই বুদ্ধের ধর্ম ভারতবর্ষে ও বহির্ভারতে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। দ্বিচক্রযান পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়ে অকেজো হইয়া পড়ে, সেইরূপ

ভিক্ষু ও গৃহীদের মধ্যে মধুর সম্পর্কে থাকিলে ধর্ম ও সমাজের উন্নতি হইবে। বুদ্ধের উপদেশ আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে।"

সুখো সঙ্ঘস্স সামগ্গি, সমগ্গানং তপো সুখো।

জগতে বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখকর, সদ্ধর্মের প্রচার ও প্রসার সুখের নিদান। ভিক্ষু ও গৃহীসঙ্ঘের একতাই সুখের আস্পদ আর সম্মিলিতভাবে তপস্যা পরম সুখ ও নির্বাণ লাভের উপায়।

ঐ অভিভাষণে তাঁর সাংগঠনিক ভাবনা এবং সমাজ সচেতনতার কথাই প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। ভিক্ষু-সমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করার তাঁর প্রয়াস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "বন্ধুগণ, এই নগণ্য ভিক্ষু প্রথম জীবনে সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের কার্যকরী সদস্য ও পরে সম্পাদকরূপে সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সুযোগ লাভ করে। ১৯৩৫ সালে ইহার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী রচনা করি। সমগ্র বাঙ্গালী ভিক্ষুদিগকে এক সংস্থায় সম্মিলিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা গঠিত হয়। উহা এখন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা। উহার নায়ক সমগ্রদেশের ধর্মীয় সর্বাধিনায়ক। এতদিন ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি স্নেহভাজন ভিক্ষু ড. সত্যপাল, শিল্পাচার্য রতনজ্যোতি মহাস্থবির প্রমূখ কয়েকজন যুবক সদস্যের সহায়তায় ইহা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সকল যোগ্য কর্মীর হাতে পরিচালনা ভার পরিলে মহাসভা অচীরে শক্তি লাভ করিবে। মহাসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনারও পরিবর্তন করিতে হইবে। সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা গঠনের মূলে রহিয়াছে থেরবাদ এবং স্বনিকায়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও সম্প্রসারণের প্রেরণা বঙ্গদেশে এই থেরবাদ নিকায় প্রতিষ্ঠার মূলে পরম শ্রদ্ধেয় সঙ্ঘরাজ সারমেধ, আচার্য পূর্ণাচার, রাজগুরু জ্ঞানালঙ্কার প্রভৃতি সঙ্ঘনায়কগণ এবং শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, গুণালঙ্কার মহাস্থবির—প্রমূখ অপর মহাস্থবিরগণের ত্যাগ, নিষ্ঠার অবদান রহিয়াছে। তাঁহাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আপনারা যোগ্যতার সহিত ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন, ইহাই এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের আন্তরিক আবেদন।"

আজ আমি তাঁর সেই ধর্ম ও সমাজ ভাবনার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর কর্মপ্রতিভা ও আন্তরিক প্রয়াসে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ ও থেরবাদ বৌদ্ধসঙ্ঘ উভয়ই গতি লাভ করে শতধারায়। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের সেই গতিপথে পণ্ডিত ধর্মাধার কেবল ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন না, ছিলেন বঙ্গীয় বৌদ্ধকূলের একটি শতাব্দীকালের অধ্যায়। ১৯০১ সালের ২৭শে জুলাই শুরু হয়ে এ অধ্যায়ের যবনিকা ঘটে ২০০০ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে। আজ বক্তৃতা সিরিজ প্রবর্তন করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁদের সাথে আজ থেকে আমিও সংশ্লিষ্ট হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাই আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে পরম পুরুষ পণ্ডিত ধর্মাধার স্মরণে লেখা 'নৈরাঞ্জনার ঐতিহ্য' শীর্ষক আমার এ ক্ষুত্র স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করছি। এ পূত পবিত্র উপলক্ষ্যে প্রাতঃ স্মরণীয় পরম পূজ্য প্রয়াত ধর্মাধার মহাস্থবিরকে শত সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।

পণ্ডিত ধর্মাধারের বর্ষাবাস উদ্‌যাপন

আব্দুল্লাহপুর শাক্যমুনি বিহার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম (১৯২২-১৯২৪), মির্জাপুর গৌতম আশ্রম বিহার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (১৯২৪-১৯২৭), পাট্টালিকুল বৌদ্ধ বিহার, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম (১৯২৭-১৯২৮), সদ্ধর্মোদয় পালি পরিবেণ, পানাদুরা, শ্রীলঙ্কা (১৯২৮-১৯৩২), ধর্মদূত বিহার, রেঙ্গুন, বার্মা (১৯৩২-১৯৩৩), মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম (১৯৩৩-১৯৪৫), ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, কলিকাতা (১৯৪৫-১৯৫৪), বার্মা অনুষ্ঠিত ষষ্ঠসঙ্গায়নে (১৯৫৪-১৯৫৬), ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, কলিকাতা (১৯৫৬-১৯৮৮), কলিকাতা এবং বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কলিকাতা (১৯৮৮-২০০১)।

পণ্ডিত ধর্মাধারের কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের নাম ও প্রকাশকাল

ভাবপরিবর্তন, বিমুক্তি সুখ (১৯৩১), চরম শান্তি, অনাদি সংসার, নির্বাণ (১৯৩২), বৌদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য, জন্মান্তরবাদ (১৯৩৩), প্রতিসন্ধিদা কার্যকারণ (১৯৩৫), অভিনিবেভাগ রূপ (১৯৩৬), সমালোচনা (১৯৩৮), কর্মতত্ত্ব, অভিভাষণ (১৯৩৯), বোধিসত্ত্ব (১৯৫১), মৈত্রী সাধনা (১৯৫৩), অনাত্মাবাদ (১৯৫৪), বঙ্গসংস্কৃতি ও ইহার প্রসার (১৯৫৫), অহিংসা ও আমিষাহার (১৯৫৬), নালন্দা বিদ্যাভবন, মৃত্যুর পরে (১৯৬৬), নেত্তিপকরণ পরিচয়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, নেত্তিহার পরিচয় (১৯৬৭), অবদান সাহিত্যে বুদ্ধকথা (১৯৬৯), অভিধর্ম নিদান (১৯৭০), অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক, বিগত শতাব্দীর বৌদ্ধসমাজ ও সঙ্ঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার (১৯৭১), মহাস্থবির অভয়শরণ, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম, বাংলাদেশে বৌদ্ধমেলা, স্মৃতিপথে কৃপাশরণ (১৯৭৩), জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, অস্পৃশ্যের প্রতিকার (১৯৭৪), সমাজ সংস্কারক হরিমাথে (১৯৭৫), মহাস্থবির ধর্মকথিক (১৯৭৭), সঙ্ঘনায়ক তেজবন্ত মহাস্থবির (১৯৭৮), তাম্রলিপ্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি (১৯৭৮), ব্যবহারিক জীবনে অহিংসার প্রয়োগ (১৯৮০), দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান স্মরণে (১৯৮১), মহান বিদর্শনাচার্য উ শোভন স্মরণে, বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ ও ড. অরবিন্দ বড়ুয়া, আসামে বড়ুয়া বৌদ্ধদের অবদান, অহিংসা (১৯৮২), বিদর্শন ভাবনার প্রসার (১৯৮৫), অসম জাতির কৃতিত্ব, আসামে বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্মরক্ষিত প্রসঙ্গে (১৯৮৭), ভারতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ, প্রতিভাদীপ্ত শান্তপদ মহাথের (১৯৮৮), বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষুসঙ্ঘের ভূমিকা, ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ সমাজ, পাহাড়তলী গ্রামের অতীত ঐতিহ্য (১৯৮৯), আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধ দীক্ষা সমারোহ ড. আম্বেদকরের চিন্তাধারা, বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল (১৯৯০)।

তথ্যসূত্র ঃ

১। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, জিনবোধি ভিক্ষু, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯১।

২। নালন্দা, ধর্মাধার মহাস্থবির জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ড. অমল বড়ুয়া, কলিকাতা, ২০০১।

বিষয় অনুক্রম

১. বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ ও তপশ্চর্যা

১.১. মহাভিনিষ্ক্রমণ ও রাজগৃহে আগমন
১.২. রাজা বিম্বিসারের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন
১.৩. অলাড়-কালাম ও রামপুত্র-উদ্রকের নিকট ধ্যান চর্চা
১.৪. সিদ্ধার্থের প্রথম উরুবেলা আগমন ও কঠোর তপশ্চর্যা
১.৫. ডুঙ্গেশ্বরী
১.৬. সুজাতা-কুটি
১.৭. মাতঙ্গ বাপী ও সুজাতার ক্ষীরান্ন দান
১.৮. সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থ ও সিদ্ধার্থের ক্ষীরান্ন ভোজন

২. বুদ্ধত্ব অর্জনে উরুবেলা ও নিরঞ্জনার মাহাত্ম্য

২.১. উরুবেলা ও নৈরঞ্জনার প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব
২.২. তাপস সিদ্ধার্থের মারবিজয়
২.৩. বোধিবৃক্ষ ও সাত মহাস্থান
  (ক) বোধি-মণ্ডপ
  (খ) অনিমেষ-চৈত্য
  (গ) চংক্রমণ-চৈত্য
  (ঘ) রত্ন-ঘর
  (ঙ) অজপাল-বৃক্ষ
  (চ) মুচলিন্দ
  (ছ) রাজায়তন-বৃক্ষ

৩. বুদ্ধের ধর্মাভিযান

৩.১. বুদ্ধের সারনাথ গমন ও ধর্মচক্র-প্রবর্তন
৩.২. কাশ্যপ ভ্রাতৃ-ত্রয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ
৩.৩. গয়াশীর্ষ ও আদিত্য-পর্য্যায়-সূত্র দেশনা
৩.৪. দ্বিতীয়বার রাজগৃহে গমন ও রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা

৪. নিরঞ্জনা শব্দের তাৎপর্য ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

৪.১. নিরঞ্জনা শব্দের বুৎপত্তি
৪.২. নিরঞ্জনা শব্দের অর্থ

৪.৩. নিরঞ্জনা শব্দের প্রকৃতি
৪.৪. নদী অর্থে নিরঞ্জনা
৪.৫. বৈদিক সাহিত্যে নিরঞ্জনা
৪.৬. পালি সাহিত্যে নিরঞ্জনা
৪.৭. নিরঞ্জনা নদীর ভৌগোলিক বিবরণ ও এর ব্যাপকতা

৫. নিরঞ্জনা নদীর ধর্মীয় মাহাত্ম্য

৫.১. বৈদিক পরম্পরায় নিরঞ্জনার ধর্মীয় মাহাত্ম্য
৫.২. বৈদিক ঐতিহ্যে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান
৫.৩. বৌদ্ধ পরম্পরায় নিরঞ্জনার ধর্মীয় মাহাত্ম্য
৫.৪. বৌদ্ধ ঐতিহ্যে পিণ্ডদান
৫.৫. বৌদ্ধধর্মে পুণ্যদান ও প্রেতকথা
(ক) ক্ষুৎপিপাসা প্রেত
(খ) বন্তাসিকা প্রেত
(গ) নিঝাম-তৃষিক প্রেত
(ঘ) পরদত্তুপজীবী প্রেত

৬. গয়া ও বুদ্ধ-গয়ার প্রসঙ্গ কথা

৬.১. গয়া শহরের প্রাচীনত্ব
৬.২. বিষ্ণু-গয়া ও বুদ্ধ-গয়া
৬.৩. বুদ্ধ-গয়া

৭. ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নানা মতবাদ

৮. বৌদ্ধ কর্মবাদ

৯. নিরঞ্জনার ঐতিহ্য (নিষ্কর্ষ)

পরিশিষ্ট

(ক) মহাবোধি (বিহার) মন্দির
(খ) ধর্মারণ্য
(গ) একটি প্রস্তাবনা

নিরঞ্জনার ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি

১. বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ ও তপশ্চর্যা

১.১. মহাভিনিষ্ক্রমণ ও রাজগৃহে আগমন ঃ

রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাঁর পত্নী যশোধরা, মাতা-পিতা-স্বজন, পরিবার-পরিজন, রাজা-প্রজা কারোর প্রতি কোন প্রকারের মায়া-মমতা না দেখিয়ে রাহুলের জন্মের দিন (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) রাতে সবার অগোচরে সারথী ছন্ন ও অশ্ব কন্থককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সাহিত্যে একেই বলা হয় বোধিসত্বের মহাভিনিষ্ক্রমণ; অর্থাৎ পরম জ্ঞান ও পরম সুখের সন্ধান। এক প্রত্যন্ত অনোমা নদীর ধারে রাজকীয় বেশভূষা সারথীর হাতে দিয়ে তাপস বেশে তিনি অশ্রুসিক্ত ছন্ন ও কন্থককে বিদায় দেন।

পীতবস্ত্রধারী হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে মহাত্যাগীর পূর্ণ প্রতিমূর্তি তাপস সিদ্ধার্থ এগিয়ে চলেন এক অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে। কয়েক রাজ্য পেরিয়ে শেষে পৌঁছোলেন তিনি মগধ সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী পাঁচ পাহাড়ে ঘেরা রাজগৃহে।

১.২. রাজা বিম্বিসারের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঃ

ক্রমান্বয়ে বেশ কয়েকদিন চির অভ্যস্ত আহার-পানীয়ের অভাবে এবং অনভ্যস্থ উচ্ছিষ্ট ও বর্জিত আহার গ্রহণের প্রভাবে তাপস সিদ্ধার্থের কাঞ্চন-বর্ণের রূপ (কায়) বিবর্ণ ও জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। একদিন মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর রাজপ্রাসাদের উপরিতলে বসে রাজপথে চলা পথচারীদের দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর শ্যেনদৃষ্টি শান্ত-দান্তভাবে গমনশীল এক পীতবস্ত্রধারী ভিক্ষাচারীর প্রতি পড়ে।

"ত্বমদ্দসা বিম্বিসারো, পাসাদস্মিং পতিট্ঠিতো।
দিস্বা লক্খণসম্পন্নং, ইমত্থং অভাসি।
ইমং ভোন্তো নিসামেথ, অভিরূপো ব্রহা সুচি। (পব্বজ্জাসুত্ত, সুত্তনিপাত)

ঐ ভিক্ষুকবেশী যতই নিজেকে নামগোত্রহীন করে রাখুক না কেন, যতই তিনি দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ুক না কেন, তাঁর দেহ-সৌষ্ঠবের (যষ্টি) কোথাও না কোথাও রাজবংশোদ্ভূত হবার বিশেষ লক্ষণসমূহ রাজা বিম্বিসারের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি।

রাজা বিম্বিসারের জীবনে ঘটিত আরো কিছু এমন ঘটনা রয়েছে যা হতে স্পষ্ট সঙ্কেত পাওয়া যায় যে তিনি এব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এক গুপ্তচরকে নির্দেশ দিলেন তাপস সিদ্ধার্থের দিনচরিয়া সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখার এবং গোপন খবর সংগ্রহ করার। রাজার নির্দেশে রাজদূত ঐ তাপসের অনুগমন করে ঐ পাঁচ পাহাড়ের একটিতে পৌঁছোন। ঐ পাহাড়ের নাম পাণ্ডব। এ পাহাড়েরই এক গুহায় ঐ তাপস থাকতেন। বেশ কয়েকদিন পর রাজার প্রেরিত ঐ রাজদূতের মুখে ঐ ভিক্ষুর গোপন খবর পেয়ে রাজা তাপস সিদ্ধার্থকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনেন রাজপ্রাসাদে।

রাজা নিজ হাতে আসন পেতে তাঁর আদর-আপ্যায়নের এবং আহারাদি দানের ব্যবস্থা করেন। এরপর মগধরাজ তাঁর কাছে তাঁর পরিচয়, তাঁর রাজগৃহে আগমনের কারণ ও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য জানতে চান। তাপস সিদ্ধার্থ মগধরাজের সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। মগধরাজ জানতে পারলেন ভিক্ষাচারীবেশী এ তাপস তাঁরই বন্ধুবর শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র। পরম জ্ঞান আর পরম শান্তির খোঁজে তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করেছেন। যাত্রাপথে তিনি নানা খ্যাতনামা গুণী ও গণ আচার্যদের মত ও পথ অনুশীলন করেছেন। তখন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী ও যতিগণ নানা ধার্মিক ও দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের মত ও পথে তাঁর অভীষ্ট পরম জ্ঞান ও পরম সুখের সন্ধান না পেয়ে তিনি এবার তৎকালীন তীর্থরাজ গয়া যাবার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

রাজা বিম্বিসার তাঁর বন্ধুপুত্র তাপস সিদ্ধার্থকে অর্ধেক রাজ্য দেবার আশ্বাসন দেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর সঙ্কল্পে অটুট দেখে তিনি আর বেশী সাধাসাধি করলেন না। তবে অনুরোধ করলেন অভীষ্ট পরম জ্ঞান পরম সুখ পেলে তিনি যেন অবশ্যই রাজগৃহে আসেন এবং তাঁকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দান করে কৃতার্থ করেন। তাপস সিদ্ধার্থ নীরবে সম্মতি প্রদান করলেন (জাতক নিদান)।

১.৪. সিদ্ধার্থের প্রথম গয়া-আগমন ও কঠোর তপশ্চর্যা ঃ

এরপর তাপস সিদ্ধার্থ এক অজানা আকর্ষণে গয়ার পথে এগিয়ে চলেন। কয়েকদিনের পদযাত্রার পর তীর্থরাজরূপে অতিখ্যাত গয়ায় এসে পৌঁছোন। সেখানে দূর দূর জনপদ হতে আগত তীর্থগামী, পুণ্যার্থী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচার্যগণকে নিজ নিজ শিষ্য-সমূহের সাথে নানা আকারের নানা প্রকারের তপশ্চর্যা করতে দেখেন। কাউকে দেব-দেবী বা তথাকথিত ঈশ্বর বা ব্রহ্মার নামে জটাবল্কলধারী হতে দেখেন; কাউকে অগ্নিহোত্রী হতে দেখেন। কাউকে শ্মশানবাসী হতে দেখেন। কাউকে নীলাম্বরী হতে দেখেন। কাউকে আবার মাসে একবার কুশাগ্রে রাখা সামান্য অন্ন খেয়েও তপশ্চর্য্যা করতে দেখেন (ধর্মপদ-১১/৭০)। কাউকে বহু বিত্ত ব্যয় করে ঘৃতাহুতি করতে দেখেন। কাউকে পঞ্চাগ্নি-তপ করতে দেখেন। আবার অনেককে নানা প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধন করতেও দেখেন। যাগযজ্ঞে অত্যাবশ্যক ঘৃতের অনাবশ্যক পরিমাণে প্রযুক্ত হওয়ায়, বলি দেবার উদ্দেশ্যে আনীত থূপকাষ্ঠে বাঁধা যজ্ঞপশুর উপর ধর্মাচরণের নামে পাশবিকতাপূর্ণ নির্মম অত্যাচার হওয়ায়, তাদের আর্তনাদে, তাদের রক্তরঞ্জিত মাটিতে ও জলে নিরঞ্জনা (ফল্গু) নদী ও উরুবেলার আকাশ-বাতাস পরিবেশ প্রদূষিত হয়ে পড়েছিল।

এসব দেখে তাঁর হৃদয় মহাকরুণায় দ্রবিত হয়। যজ্ঞাগ্নিতে পরিবেশ প্রদূষণের কারণে তিনি বোধ হয় তথাকথিত তীর্থরাজ গয়া ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জীব ও জগতের তথাকথিত স্রষ্টার আবাসভূমি সত্তার বাইরে কোথাও না পেয়ে এবার তিনি নিজের ভেতরে তাকে খোঁজার সঙ্কল্প নেন। ঢেকিতে ধান কুটলে বা যন্ত্রে সম্প্রেষিত করলে ধান যেমন চ্যাপ্টা হয়ে ক্ষীণ হয় আর তার ভেতরের রস (নির্যাস) বাইরে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থও কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্ম-নিপীড়িনের মাধ্যমে শরীরকে চিড়ে-চ্যাপ্টের ন্যায় করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে জীব ও জগতের তথাকথিত ব্রহ্মা বা ঈশ্বর যদি ভেতরে কোথাও থেকে

থাকে তাহলে ত্রাহি ত্রাহি করে বেরিয়ে এসে যেন নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। তাই একাজে আত্ম-নিপীড়নকেই অন্য মার্গ অপেক্ষা অধিক সহায়ক মনে করে তিনি যার-পর-নেই আত্ম-নিপীড়নের অশ্রুত-পূর্ব দুষ্কর তপশ্চর্যা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন (আর্য্যপর্য্যেষণ-সূত্র, মধ্যম-নিকায়, প্রথম খণ্ড)।

এরপর তাপস সিদ্ধার্থ নিরঞ্জনা নদীর ধার ধরে জলস্রোতের বিপরীত দিকে এগিয়ে চলেন। সেনানি-গ্রামের কাছে অপেক্ষাকৃত এক নির্জন এলাকায় পর্বতগুহায় তিনি তাঁর তপস্যায় রত হন। প্রথম পর্বে ঃ তিনি স্থূল-আহারের পরিমাণ ক্রমশ তিনি কমাতে থাকেন। এর পরবর্তী পদক্ষেপে ফলবীজের দানা খেয়েও তিনি তপশ্চর্যার লীন হতে থাকেন (বোধিরাজকুমার-সূত্র, মধ্যম-নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড)। ঐ সময় কপিলাবস্তুবাসী গণক ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিণ্য সহ আর চারজন (বপ্প, ভদ্রীয়, অশ্বজিৎ ও মহানাম) ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে সংযোগ-বশতঃ গয়ার আশে-পাশে কৃচ্ছ্রসাধনের তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাপস সিদ্ধার্থের দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধনার উৎকর্ষতা চরম পর্য্যায়ে পৌঁছোয়।

গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় থাকায় মাঝে-মধ্যে গ্রামবাসীরা বিশেষত রাখাল বালকেরা সিদ্ধার্থের তপোভূমির পাশ দিয়ে যেতো। তাঁদের চোখে এধরণের কৃচ্ছ্রসাধন এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। গ্রামের পশুচারকরা এমন তপশ্চর্য্যার কথা গ্রামবাসীদের কাছে উৎসাহের সাথে শোনায়। গ্রামবাসীদের মুখে মুখে তাপস সিদ্ধার্থের তপশ্চর্য্যার কথা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কপিলাবস্তু হতে আগত ঐ পাঁচজন তাপসের কানেও একথা যায়।

এদিকে ঐ পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ তপস্বী দীর্ঘদিন যাবৎ তপশ্চর্য্যা করেও এতদিন কাউকে তাঁরা গুরুরূপে মেনে নেন নি। তাই তাঁরা লোকমুখে শোনা ঐ ধরণের কঠোর তপশ্চর্য্যাকারীর খোঁজে বেড়িয়ে পড়েন। শেষে তাপস সিদ্ধার্থের তপোভূমিতে এসে পৌঁছোন। যা দেখলেন তা তাঁদের কাছে সত্যই অদৃষ্টপূর্ব। এমন কি অশ্রুতপূর্ব হওয়ায় তাঁরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। মনে মনে তাঁরা তাঁকে তাঁদের গুরুরূপে মেনে নেন। আর তপশ্চর্য্যার সাথে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার মনোযোগ দিলেন। তাঁদের সেবা-সৎকার পাওয়া সত্ত্বেও তাপস সিদ্ধার্থ তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনার মাত্রা কিছুতেই কমান নি, বরঞ্চ বাড়িয়েই চলেছিলেন। শেষে শুরু হলো কৃচ্ছ্রসাধনের চরম পর্য্যায় নিরাহার ও নির্জলা-উপবাস। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন নিরাহারে নির্জলা-উপবাসে থাকায় তা তাঁর কাছে একেবারে প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল। সংজ্ঞাহীন হয়ে তিনি কয়েকবার মূর্ছা যান।

এভাবে মহাভিনিষ্ক্রমণের পর তাঁর প্রায় ছ'বছর কাটতে চলেছিল। তাঁর হৃষ্ট-পুষ্ট কাঞ্চনবর্ণ দেহ-কাঠামো একেবারে অস্থি-কঙ্কাল-সার ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। চোখের মণি দুটো এমনভাবে কোটরগত হয়ে পড়ে যেন ওগুলো গ্রীষ্মকালের এক গভীর কুয়োর মাটিছোঁয়া জলে দৃশ্যমান দুটো উজ্জ্বল মণি (বোধিরাজকুমার-সূত্র, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড)। তাঁর দেহযষ্টি ক্ষীণ হতে এতই ক্ষীণতর হয়ে পড়েছিল যে দেখামাত্রই মনে হত তাঁর দেহে যেন রক্ত-মাংস বলতে কিছুই নেই। শিরা-উপশিরায় আবৃত হাঁড়-পাঁজরগুলো যেন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। উদরের পাকস্থলী যেন শুকিয়ে একেবারে মেরুদণ্ডকে ছুঁয়েছে। সব মিলে দেখে মনে হত তিনি যেন নিষ্প্রাণ

কন্টকাকীর্ণ শুকনো এক ছোট আকারের বৃক্ষ। তা যেন পদ্মাসন-আকারের মূলাধারে দাঁড়িয়ে আছে। মার এসে বারে বারে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে বলতে থাকেন—"হে তাপস, তোমার নিরান্নব্বই শতাংশ জীবন মৃত্যুর সন্নিকট, কেবল একাংশই বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে।

'কিসো ত্বমসি, দুব্বন্নো, সন্তিকে মরণং

সহস্সভাগো মরণস্স, একংসো তব জীবিতং'। (পধানসুত্তং, সুত্তনিপাত)

এরপর পঁয়ত্রিশ বছর আয়ুষ্কাল পূর্তির বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্কালে হঠাৎ তাঁর একবার আবার জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর এ প্রাণান্তকর কৃচ্ছ্রসাধনের কোন সুপরিণাম নেই। পরম জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজন সুস্থ মনের। আর সুস্থ মনের জন্যে প্রয়োজন সুস্থ দেহের। সুস্থ দেহধারী হতে হলে প্রয়োজন হয় পরিমিত সুস্থ (পৌষ্টিক) আহার। তাই তিনি সুখ প্রাপ্তির পরম্পরাগত দুই অতিমার্গ ত্যাগ করে মধ্যম-মার্গ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন (বোধিরাজকুমার সূত্র, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড)। ঐ পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ তাপসদের সেবা-শুশ্রূষায় তিনি কোনক্রমে ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে গ্রামে বিচরণ করার মনোবল যোগান।

১.৫. ডুঙ্গেশ্বরী

বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ তীর্থরাজ গয়ায় আসার পর যে স্থানে তাঁর দুষ্কর তপশ্চর্যা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের অন্বেষায় নিজেকে কঙ্কালবৎ করেছিলেন ঐ স্থানটি নিরঞ্জনা নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত। সেখানে অনুচ্চ পর্বত শৃঙ্খলার একটিতে এক গুহা রয়েছে। স্থানীয় গ্রামাবাসীদের বিশ্বাস ঐ গুহাতেই তাপস সিদ্ধার্থ ঐ অভূতপূর্ব তপশ্চর্যা করেছিলেন। ঈশ্বর প্রাপ্তির দুষ্কর তপশ্চর্যার এ ছিল তুঙ্গ (চরম) অবস্থা। তুঙ্গ-ঈশ্বর শব্দই খুব সম্ভবত তুঙ্গেশ্বরীতে, আরও পরে তা ডুঙ্গেশ্বরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মগধদেশে বৌদ্ধ জনশূন্য হওয়ায় পরে এ গুহাটি গ্রামবাসীদের অধীনস্থ হয় এবং খুব সম্ভবত হিন্দু ধর্মাবলম্বী পাণ্ডাদের অধীনস্থ হয়। তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় স্বার্থে এ গুহাটির নামকরণ হিন্দু দেবী ডুঙ্গেশ্বরীর নামে করে ফেলে। আজ ঐ নামেই এ গুহাটি অধিক পরিচিত। শ্রীলঙ্কাবাসী বৌদ্ধগণ একে 'প্রাক্‌বোধিস্থান' রূপে চিহ্নিত করেন। এ নামেই তাঁরা এর পূজা-বন্দনাদি করেন। বার্মাবাসীদের নিকট তা 'দুষ্করচরিয়' নামে বন্দিত হয়। বাংলায় এটির অর্থ 'দুষ্করচর্য্যা'।

১.৬. সুজাতা কুটি ঃ

বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ তাঁর দুষ্কর তপশ্চর্য্যা ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ঐ সঙ্কল্পের সাথে তাপস সিদ্ধার্থ বহুকাল পর তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনের আসন ত্যাগের সঙ্কল্পও নিয়েছিলেন। কেবল কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগের সঙ্কল্প নিলেই শরীরের দুর্বলতা কেটে উঠে না। এ দেহকে দিতে হয় তার যোগ্য আহার। ঐ আহার এখানে তাঁকে কে যুগিয়ে দেবে? এ এলাকা যে বড়ই নির্জন। কে জানে তিনি কতদিন উপোস আছেন? কাজেই তাঁকেই এ গুহা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়তে হবে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে। গুহা ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে এদিক ওদিক চোখ বুলোন তিনি। সম্মুখে নিরঞ্জনার বিস্তৃত ধূসর বালুকাচর। পেছনে মরা কালো পাথরে তৈরি অনুচ্চ পর্বতমালা। দক্ষিণে ধূসর বর্ণের মাটি। উত্তরে বেশ দূরে অর্থাৎ প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রাম।

এ গ্রামে গেলেই যে ভিক্ষা পাবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তবুও ওদিকে পা না বাড়িয়ে তাঁর আর কোন বিকল্প ছিল না। বহুদিনের নিরাহারে ও নির্জলা উপবাসে থাকার কারণে শারীরিক শক্তি বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। তবুও মনের জোরে নড়-বড়ে শরীরে একটু একটু করে পা ফেলে এগিয়ে চলেন তিনি ঐ গ্রামের দিকে। পথে লোকমুখে জানলেন এ গ্রামের নাম সেনানী-গ্রাম। অনেকে একে সেনা-নিগমও বলে থাকেন।

আরও তিনি জানলেন ঐ গ্রামে সেনানী নামে এক জমিদার থাকেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে গ্রামের এ নামকরণ হয়েছে। আরও শুনেছেন—এ গ্রামে আরও অনেক লোকের বসতি রয়েছে।

মানে-সম্মানে মান্য-গণ্য প্রতিষ্ঠিত এ পরিবারে এক শুভক্ষণে এক কন্যা জন্মেছিল। ঐ কন্যার জন্ম-লগ্ন হতেই ঐ পরিবারের মান মর্যাদা, সুখ-সম্পত্তি-ভোগের উপকরণ বেড়েই চলেছিল। খামারে গোলায় গোলায় ধান আর অন্যান্য শষ্য-সম্ভার। গোয়ালে গাভী, বলদ আর গো-বাছুর প্রচুর। তাই এ কন্যার নাম আদরে রাখা হয়েছিল সুজাতা।

সুজাতার পৈতৃক বাড়ী-ঘর দালান-কোঠা আর সবার থেকে ভিন্ন। দর্শনীয় তো বটেই। স্বজন-পরিজনে তাঁর পরিবার একেবারে ভরপুর। তেমনি রূপে-গুণে, আচার-ব্যবহারে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সুজাতাও কারো থেকে কম বলা যায় না। ঐ গ্রামের আর সব কন্যাদের চেয়ে অনেকটা অগ্রণীয়া। গ্রামবাসীরা সুজাতার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। সুজাতার এ পৈতৃক বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠা, বাস্তুভিটা আজ স্থানীয় লোকের কাছে সুজাতা কুটি নামে অতি চর্চিত ও দর্শনীয় স্থান।

১.৭. মাতঙ্গ বাপী ও সুজাতার ক্ষীরান্ন দান ঃ

মাতা পিতা, স্বজন-পরিজনদের কোলে-পিঠে, সখা-সখীদের আমোদে-প্রমোদ আর দাস-দাসীদের সেবা-শুশ্রুষায় পালিতা হয়ে সদ্যফোটা কমল ফুলের ন্যায় সুজাতা ক্রমশ রূপে-গুণে অপরূপা ষোড়শী হয়ে উঠে। পরিবারের সকলের, এমন কি গ্রামবাসী সকলের নয়নমণি হয়ে পড়ে ঐ সুজাতা। তাঁর সুনাম, সুযশের সুগন্ধ আর সেনানী গ্রামের সীমানায় সীমিত থাকে নি। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সুজাতার সুগন্ধ দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাই নানা দেশের মান্য-গণ্য প্রতিষ্ঠিত পরিবার হতে তাঁর পাণি গ্রহণের প্রস্তাব আসতে থাকে।

যখনই কোন বিয়ের প্রস্তাব নতুনভাবে আসে সুজাতার মনে এক সুপ্ত চিন্তা জেগে উঠে। বিয়ে হলে নিজ পরিবার, স্বজন-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবী, সখা-সখী, দাস-দাসীদের ছেড়ে অন্য কোন অপরিচিত পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হয়ে পড়বেন, অন্য কোন্ অপরিচিত পরিবারকে আপন ভাবতে হবে, অন্য কোন্ অপরিচিত কন্যা বা মহিলাদের আপন করতে হবে—বারে বারে তাঁর অন্তরে এ চিন্তা জাগে। সখা-সখীদের, দাস-দাসীদের এবং অন্য গ্রামবাসীদের বিশেষত মহিলাদের মুখে সুজাতা শুনতে পেরেছিলেন—তাঁদের গ্রামে এক পুরানো বটবৃক্ষ আছে। গ্রামের মহিলাদের ঘরোয়া কত শত সমস্যা থাকে। আশা-প্রত্যাশার সাথে জীবনে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। গ্রামে মা, মেয়ে, মহিলারা সুখে-দুঃখে মনের কথা, মনের ব্যাথা ঐ বৃক্ষকে জানায়। মনের মিনতি জানিয়ে তাঁরা শুধু যে খুব হাল্কা বোধ করেন,

তা নয়। তাঁদের বিশ্বাস ঐ বৃক্ষে নিশ্চয়ই কোন বন-দেবতা অবস্থান করেন। ভক্তি ভরে বৃক্ষ-দেবতার পূজো-অর্চনা করলে সব ঘরোয়া সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সব মনোবাসনার নাকি অচিরেই পূর্তি হয়ে যায়।

একদিন মাতা-পিতা ও পরিজনদের কাউকে কিছু না বলে সখীদের নিয়ে সুজাতা ঐ বৃক্ষের কাছে যায়। সখীদেরও কাউকে কিছু না বলে মনে মনে এক মিনতি (প্রার্থনা) করে বসে। তাঁর মিনতিটি ছিল এরূপ—"হে বৃক্ষ-দেবতা, মনোনুকুল মানুষের জীবন-সঙ্গিনী, আর প্রথমে পুত্র-সন্তানের মা হতে পারলে সুযোগ বুঝে এক পূর্ণিমা-তিথিতে এখানে পূজো দেব"। সখীদের কে কি মিনতি করলো তাও সবার অজ্ঞাত রইল। সবাই স্ব-স্ব স্থানে ফিরে এল।

এর কিছুদিন পর এক শ্রেষ্ঠী-পুত্রের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। যথাসময়ে তিনি মনোকামনা মতে প্রথম পুত্র-সন্তানের মা হন। অনেকের মতে তিনি বারাণসীর সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠী-পুত্র যশের সহধর্মীনি ছিলেন। পুত্র-সন্তানের মা হবার সৌভাগ্য হওয়া আর কালবিলম্ব না করে পিতা-মাতার স্নেহালয়ে অর্থাৎ সেনানী গ্রামে ফিরে আসেন। ফিরে এসেই পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আসন্ন বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে স্থানীয় পূর্বোক্ত বৃক্ষ-দেবতাকে পূজো দেবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। সাথে এর প্রস্তুতিতে এক বিশেষ আয়োজন করার সঙ্কল্পও সুজাতা সবাইকে ব্যক্ত করেন। বিশেষ ক্ষীরান্ন তৈরির প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েকটি বার এক গাভীর দুধ আরেক গভীকে পান করিয়ে ক্ষীরান্ন তৈরির দুধ পূর্বাপেক্ষা অধিক ঘন করানো হয়। এ প্রস্তুতিতেই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শুভ মুহূর্ত এসে পড়ে। উষালগ্নেই ক্ষীরান্ন তৈরি হয়। স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সেরে সুজাতা ও তাঁর সখীরা সবাই সেঁজে-গুঁজে তৈরি হয়। তবে সুজাতা প্রথমে না গিয়ে পূর্ণা নামে এক দাসীকে ঐ বৃক্ষ-দেবতার গোঁড়া ও আশে-পাশের জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পত্রে-পুষ্পে সাজিয়ে ধূপে-দীপে সুগন্ধিত করে তোলার দায়িত্ব দেন সুজাতা নিজেই।

অন্যদিকে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ সেনানী গ্রামের পথ ধরে খুবই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন। এতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। খানিক-ক্ষণ তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু দূরেই বড়-সড় এক প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখেন। তাপস সিদ্ধার্থ ঐ বৃক্ষেরই গোঁড়ায় বিশ্রাম নেবেন ভেবে এগিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ঐ বটবৃক্ষমূলে এসে পৌঁছোন আর তার শীতল ছায়াময় বেদীতে বসে পড়েন।

দাসী পূর্ণা তার সখীদের নিয়ে ঐ বটবৃক্ষের কাছাকাছি এসে এক নবাগত সন্ন্যাসীকে বসা অবস্থায় দেখে তো একেবারেই হতবাক হয়ে পড়ে। প্রথমে তো নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারে নি। পূর্ণার মনে হল বৃক্ষ-দেবতা যেন নিজে সন্ন্যাসী-বেশে বট-বৃক্ষের গোঁড়ায় এসে বসেছেন। এমন ভেবে আনন্দে মগ্ন হয়ে পূর্ণা পূর্ণানন্দে নিজেই সুজাতাকে এ সুসংবাদ দিতে হাঁফিয়ে ফুঁপিয়ে দৌঁড়ে যান।

পূর্ণাকে দেখে সুজাতা বলেন—"কি রে পূর্ণা, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? বেদীটিকে কি সাজানো হয়েছে, না হয়নি?

পূর্ণা এবার নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে বলে—"আপনি বড়ই সৌভাগ্যবতী। এবারের মনোকামনাও আপনার পূর্ণ হতে চলেছে।"

সুজাতা বলেন—কি বলছিস তুই? একটু স্পষ্ট করে বল। কেন এমন কথাটি বলছিস্? কৌতুহল আমার বেড়েই চলেছে। আমাকে আর অশান্ত করে তুলিস না। বলে ফেল সহসা, কি হয়েছে?

পূর্ণা বলে—আপনাকে সৌভাগ্যবতী না বলি কি করে? আপনার ক্ষীরান্ন খেতে যে স্বয়ং বৃক্ষ-দেবতা এক সন্ন্যাসী-বেশে এসে বসে আছেন ঐ বট-বৃক্ষ-মূলে।

সুজাতা বলেন—পূর্ণা তুই বলছিস্ কি রে? সত্যি সত্যিই বলছিস্?

পূর্ণা বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, একবারে সত্যি। বিশ্বাস না হলে চলুন, নিজ চোখে দেখুন। এক্ষুনি চলুন ক্ষীরান্ন আর সব পূজোপকরণ নিয়ে। বিলম্ব হলে তিনি অন্য কোথাও আবার চলে না যান।"

পূর্ণ মুখে এ অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা শুনে এদিক-ওদিক কিছুই না দেখে সুজাতা শুধু ক্ষীরান্ন ভরা সোনার পাত্রটি হাতে নিয়ে কিছুটা ছুটে চলেন। পেছনে পূর্ণাও চলে। বট-বৃক্ষের-তলে পৌঁছে সন্ন্যাসী-বেশে বৃক্ষ-দেবতাকে দেখে সুজাতা আনন্দে বিভোর হয়ে উঠেন। নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবতী ভাবেন। মানব-জন্ম যেন একেবারে সার্থক হল তাঁর। এর পর সুজাতা ক্ষীরান্ন ভরা সোনার পাত্রটি পূর্ণার হাতে দিয়ে আর কাল-ক্ষেপণ না করে অঞ্জলিবদ্ধ করে সন্ন্যাসী সহ বট-বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করেন। এর পর সুজাতা বট-বৃক্ষ-তলে আসীন সন্ন্যাসীর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে তাঁর শ্রীচরণে মাতা নুইয়ে প্রাণ জুড়িয়ে প্রণাম নিবেদন করেন। সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী হয়ে সুজাতাকে আশীর্বাদ দেন।

সুজাতা শুধোন—আপনি কে? আপনি কি দেবতা? নাম কি আপনার? কোথায় আপনার বাস?

সন্ন্যাসী তাপস সিদ্ধার্থ বলেন——"না মা, আমি কোন দেবতা নই। আমি সামান্য একজন মানরপুত্র মানব। নিজের ও অপর সকলের জীবন-জটাকে জটা-মুক্ত করার এক সুনিশ্চিত উপায় অন্বেষণে বেড়িয়েছি। এই মাত্র"।

সুজাতা বলেন—"হে প্রভু, সামান্য ক্ষীরান্ন এনেছি। তা গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন। বড়ই অনুগৃহীত হব। চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব"। এ বলে ক্ষীরান্নভরা সোনার পাত্র সন্ন্যাসীর (তাপস সিদ্ধার্থের) হাতে তুলে দেন।

তিনি বার বার 'দেবতা নই' বললেও সুজাতা কিন্তু তাঁকে বৃক্ষ-দেবতা রূপেই মেনে নেন আর বলেন—'আপনি যেই হোন না কেন, আমার মনোকামনা যেমন পরিপূর্ণ হয়েছে, ঠিক তেমনি আপনার মনোকামনাও পূর্ণ হোক।' এ বলে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

এর পর সুজাতা সখী পূর্ণাকে নিয়ে যার-পর-নাই আনন্দে বাড়ী ফিরে আসেন আর সবাইকে উচ্ছ্বসিত মনে মনোকামনা পূর্তির কথা বলে বেড়ান।

এ স্থানটি আজকাল মাতঙ্গ বাপী নামে অতি সুপরিচিত। কেন এটি এ নামে পরিচিত তার সঠিক বা সরাসরি কোন কারণ আমাদের জানা নেই। তবে পালি সাহিত্যের স্রোতে (মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড; অপদান অর্থকথা i.107) জানা যায় যে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ থাকতেন। নাম ছিল তাঁর মাতঙ্গ। তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের

সমকালীন বহু প্রত্যেকবুদ্ধের শেষ প্রত্যেকবুদ্ধ। এ মাতঙ্গ নামক প্রত্যেকবুদ্ধ কখন এ নিরঞ্জনা নদীর তীরবর্তী সেনানী গ্রামে এসেছিলেন কিনা এর সঠিক বর্ণনা আর কোথাও এ অবধি পাওয়া যায়নি।

১.৮. সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থ ও সিদ্ধার্থের ক্ষীরান্ন ভোজন ঃ

ওদিকে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ ক্ষীরান্নে ভরা সোনার পাত্র হাতে নিয়ে পাশে বয়ে যাওয়া নিরঞ্জনা নদীর পূর্বধারে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। দেখতে পেলেন নদীর এপাড়ে জল নেই, নদী প্রায় অন্তঃসলিলা হয়ে পড়েছে। তাই এপাড়ে স্নান না করতে পেরে ওপাড়ে কোথাও স্নান করার পর ক্ষীরান্ন ভোজন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নদীর শুকনো বালুকাচরের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন। আর পশ্চিমপাড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে (তীর্থে) বসেন। ক্ষীরান্নে ভরা সোনার পাত্রটি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখেন। এর পর ঐ সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থে (ঘাটে) দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকান। দেখতে পান নদীর পাড় হতে কিছু দূরেই কল্ কল্ শব্দে নিরঞ্জনারই একটি ক্ষীণধারা বয়ে যাচ্ছে। তাপস সিদ্ধার্থ ঐ ক্ষীণধারার হাঁটুভরা জলে স্নান করেন। এর মধ্যেই দেবতারা ক্ষীরান্নে ওজশক্তি মিশিয়ে দেন। স্নান সেরে গায়ের গেরুয়া বস্ত্র গায়েই শুকিয়ে নেন। এরপর একটু নির্জন স্থানে বসে তিনি ঐ সোনার পাত্র হতে ঊনপঞ্চাশ গ্রাস ক্ষীরান্ন ভোজন করেন। ভোজন শেষে তিনি আবার ঐ ক্ষীণধারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবলেন—এ সোনার পাত্রের আর কি প্রয়োজন? সোনারূপা তো মুমুক্ষু মানুষের কাছে এক বড় বাধক-ধর্ম তুল্য। ক্ষণ-কাল ক্ষয় না করে এর থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত। নানা কিছু চিন্তা করে শেষমেষ তিনি সঙ্কল্প নেন, এটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়াই ভাল হবে। আবার ভাবলেন—এমনি ভাসিয়ে দিলে কি লাভ? তার চেয়ে আমার সম্বোধি-প্রাপ্তির স্থান ও কাল সন্নিকট কিনা জানার অধিষ্ঠান সহ একে ভাসালে তবে কিছু লাভ হবে। সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থ বর্ণনার প্রসঙ্গে পালি অর্থকথা গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"উপগন্ত্বানাতিরম্মং নদিং সো নীলবাহিনিং,
সুপ্পতিট্ঠিতনামম্হি নদীতিত্থে নিসীদিয়।১
ভুঞ্জিত্বা উণপন্নাস পিচ কত্বান ভোজনং,
বিস্সজ্জেত্বা ততো পাতিং পটিসোতং নরাসভো।" (সমন্তকূটবণ্ণনা)

এমন ভেবে পাত্র হাতে নিয়ে অধিষ্ঠান করলেন—"আমার সম্বোধি-প্রাপ্তির স্থান ও কাল যদি অতি সন্নিকট হয়ে তাকে তবে এ পাত্র নদীর জলের উল্টোদিকে প্রবাহিত হোক।" অধিষ্ঠান করে তিনি সোনার পাত্রটি নিরঞ্জনা নদীর জলে ভাসিয়ে দিতেই দেখা গেল ঐ পাত্রটি উল্টোদিকে কিছু দূর গিয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। এ অদ্ভুত ঘটনা দেখেই তাপস সিদ্ধার্থ এক ব্যাপারে একেবারে সুনিশ্চিত হন যে তাঁর সম্বোধি-প্রাপ্তির প্রয়াস ব্যর্থ যাবে না। দুই অতি বর্জিত মধ্য মার্গের চয়ন করাটাও উচিত হয়েছে। এর পর তিনি সম্বোধি-প্রাপ্তির স্থান ও কাল দু'টিই অতি সন্নিকট এসব শুভ লক্ষণ দেখে তিনি প্রসন্ন হন। প্রসন্ন মুদ্রায় তিনি এবার আশ-পাশে কোথাও দিবা-বিহার করেন। এভাবেই দুপুর গড়িয়ে মধ্যাহ্ন আর মধ্যাহ্ন গড়িয়ে অপরাহ্ন হয়।

২. বুদ্ধত্ব অর্জনে উরুবেলা ও নিরঞ্জনার মাহাত্ম্য

২.১. উরুবেলা ও নিরঞ্জনার প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব ঃ

এ নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম পাড়ের একস্থানে বালুকাচরের (বেলাভূমি) বিস্তৃতি ঐ পাড়স্থ অন্য বেলাভূমি অপেক্ষা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে লোকে ঐ বিস্তৃত পাড়কে উরুবেলা রূপে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। এর উরুবেলা নামকরণের আর একটি কারণ পালি অর্থকথা-সাহিত্যের অধ্যয়ন হতে জানা যায়।

পালি সাহিত্যের প্রারম্ভ বিনয়-পিটকের সাথে হয়। এতে যা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা অর্থকথাচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত বিনয়-পিটক অর্থকথায় (সমন্তপাসাদিকা) প্রাপ্ত হয়। নিরঞ্জনা নদী ও তার তটবর্তী উরুবেলার উল্লেখ একত্রে বিনয়-পিটকে হয়। এ দু'টি শব্দের প্রথম ব্যুৎপত্তি ও বিশদ্ কারণ সম্পর্কে পরম্পরাগত নানা তথ্য পরিবেশন করে বিনয়-পিটক অর্থকথা।

এ সাহিত্যের অধ্যয়নে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রারম্ভিক পর্যায় নিরঞ্জনা নদীর এ পাড়টির কোন নাম ছিল না। না থাকলেও এর খ্যাতি তীর্থক্ষেত্ররূপে অবশ্যই ছিল। শুধুমাত্র মগধ-জনপদে নয়, এর প্রতিবেশী জনপদগুলোতেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুক্তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মুনি-ঋষিগণ এখানে এসে নানা উপায় অবলম্বন করতেন। যাগ-যজ্ঞে সুগতি (স্বর্গ) প্রাপ্তির উল্লেখ পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, তবে বড়ই ব্যয়বহুল হওয়ায় তা ছিল সামান্য জনের নাগালেরও বাহিরের বিষয়। মুমুক্ষু সাধারণ মানুষের মনের জিজ্ঞাসা শান্ত করার উদ্দেশ্যে নদীর জলে স্নান করে পাপ-প্রবাহিত করার শাস্ত্রীয় বিধি দানের ব্যবস্থা করা হয়। তা তৎকালীন সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শেষে তা একটি চিরাচরিত পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়। ঐ পরম্পরার অনুযায়ী হয়ে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একাধিক প্রমুখ নদীতে এমন কি ঐ নিরঞ্জনাতেও বিশেষ বিশেষ তিথিতে এমন কি মাঘের প্রচণ্ড শীতেও স্নান করে নিজেদেরকে পাপ-মুক্ত (নিরঞ্জন) মনে করার ভ্রান্ত ধারণায় বিভ্রান্ত হয় মাত্র। তা না হলে বারে বারে অগণিত মানুষকে স্নান করতে ব্যাকুল হতে হয় কেন? তা না হলে মানুষের সংখ্যা কমে না গিয়ে ক্রমশ বেড়েই চলেছে কেন? স্নানে দেহ শান্ত ও শীতল হয়। পরিণামে মনও পূর্বাপেক্ষা অধিক শান্ত হয়। এতে পাপ মুক্তি মেলে না। তা যদি হত তবে এত ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ কাউকে করতে হত না। কঠোর তপ-তপশ্চর্য্যার ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন হত না।

এ পরম্পরার অনুযায়ী ছাড়াও সমাজে তখন এমন আরেক সম্প্রদায় ছিল, যার যতিরা উপরোক্ত মতে মোটেই আস্থা রাখতেন না, বরঞ্চ এর তীব্র সমালোচনা করতেন। এদের বিশ্বাস ছিল পাপ-কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা মাত্রেই নিজেদেরকে মুক্ত করা সম্ভব। তাঁদের মতে পাপ-মুক্তির আর কোন বৈকল্পিক উপায় নেই।

যে কোন কাজের প্রারম্ভ মনেতেই হয়। কাজেই পাপ- চিন্তার উৎপত্তিও মনেতে হয়। মনে যতবার পাপ-চিন্তার উদয় হয় ততবার যতিগণকে প্রায়শ্চিত্তরূপে স্বেচ্ছায় নিরঞ্জনা নদীর বালি ঝুড়িতে ভরে এ তীরে ফেলতে হত। এ ছিল তাঁদের দিনচরিয়া বা তপশ্চর্যার এক আবশ্যিক

অঙ্গ। এ পদ্ধতিতে অনেকের অনেক দিনের প্রায়শ্চিত্ত-কর্মের পরিণামে নিরঞ্জনা-নদীর এক নিশ্চিত বেলাভূমির উচ্চতা মানুষের বক্ষস্থল অবধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ উচ্চতার কারণেই বোধ হয়। নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম পাড়ের এক নিশ্চিত এলাকার বেলাভূমির নাম হয়ে পড়েছিল উরুবেলা।

নদীর জলে ডুব দিয়ে মাত্র নিজেকে নিরঞ্জন (পাপ-মুক্ত) ভাবার ধারণাকে ভগবান বুদ্ধ একটি কুংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত ধারণা বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমন প্রসঙ্গ আসলেই তিনি বলতেন—"ওহে পুণ্যার্থীগণ, নদীর জলে ডুব দিয়ে যদি কেহ পাপ-মুক্ত হয় তা হলে তো গঙ্গা-যমুনাদির নদীর জলজ ছোট-বড় সব প্রাণীর পাপ-মুক্তি মানুষের পাপ-মুক্ত হবার বহু পূর্বে অনায়াসেই হয়ে যেতো। কারণ তারাই তো সর্বাধিককাল জলে থাকে। তা'ই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে পুণ্যার্থী মানুষের সঞ্চিত পুণ্য পাপের সাথে জলের প্রবাহে অনায়াসে প্রবাহিত হতো। তা নয় কি? যুক্তি-তর্কের কষ্টি পাথরে ঐ মতবাদ দাঁড়াতে পারে না। তবে বোধিসত্ব সিদ্ধার্থ তাঁর সম্বোধি, প্রাপ্তির দিন অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমা-তিথিতে নিরঞ্জনা নদীতে ডুব দিয়েছিলেন কেন? নিজেকে নিরঞ্জন করার প্রয়াসেই তো তিনি নিরঞ্জনাতে ডুব দেননি? ডুব তিনি অবশ্যই দিয়েছিলেন, তবে তা তাঁর পাপ-প্রবাহের উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। তা তিনি করেছিলেন শরীর শোধনের জন্যে মাত্র।

২.২. তাপস সিদ্ধার্থের মারবিজয় ঃ

অশ্বত্থ বৃক্ষ-মূলে বসে তিনি অধিষ্ঠান করেছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু;
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতঃশ্চলিষ্যতে।।

অর্থাৎ এ আসনে দেহ মোর যাক শুকাইয়া।
অস্থি চর্ম মাংস যাক প্রলয়ে ডুবিয়া।
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে।

ধ্যানে তল্লীন হতেই মার বা প্রলোভনকারী মায়া তার অস্ত্ররূপী বন্যা, আগুন, বজ্রবৃষ্টি ও ঝড়ের মাধ্যমে সিদ্ধার্থকে সঙ্কল্প-চ্যুত করার আপ্রাণ প্রয়াস করলেন। এর পর মার তার তিন কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে পাঠালেন মায়ার ছলনা দ্বারা সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করতে। কিন্তু মারের সব প্রয়াস বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ তাঁর বীর্য পরাক্রম দিয়ে বিফলে পর্যবসিত করেছিলেন।

তিনি ধ্যানের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্বরাতের প্রথম যামে আয়ত্ব করলেন 'জাতি-স্মর-জ্ঞান', দ্বিতীয় যামে আয়ত্ব করলেন সত্ত্বদের চ্যুতি উৎপত্তি জানার 'দিব্য-চক্ষু-জ্ঞান' আর তৃতীয় যামে তিনি সব অবিদ্যা ক্ষয়কারক 'আস্রব-ক্ষয়-জ্ঞান' লাভ করে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার প্রত্যুষে নব অরুণোদয়ের সাথে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হলেন এ ধরাধামে।

বোধি লাভের জন্য তিনি অসংখ্য জন্ম-ব্যাপী সংসার-চক্রাবর্তে ঘূর্ণিপাক খেয়েছেন। এখন তিনি আর গবেষক বা বোধিসত্ত্ব নন। বর্তমানে তিনি ত্রিলোকে দেব-মানব-ব্রহ্মার অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি শাস্তা সুগত বুদ্ধ। তিনি তাঁর বোধি লাভ করার সাথে সাথে উদান গাথায় বলেছিলেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিসং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং;
গহকারক, দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তো ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হান্‌ং খয়মজ্ঝগা।

(বিনয়পিটক : ধম্মপদং গাথা ১৫৩, ১৫৪)।

২.৩. বোধিবৃক্ষ ও সপ্ত মহাস্থান ঃ

নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ উরুবেলার (বর্তমান বুদ্ধগয়ার) প্রধান আকর্ষণ হল পরম পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষটি। এ বৃক্ষের নীচে বসে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ বোধি বা সম্বোধি লাভ করেছিলেন। তাই বৌদ্ধ জগতে এটি বোধিবৃক্ষ-রূপে অতি চর্চিত। এর বায়োলজিকেল নাম হল 'ফিকাস রেলিজিওশিয়া'। অনেকে একে বোধি-দ্রুম বা জ্ঞানবৃক্ষ বলে থাকেন। হিন্দি ভাষায় এ বৃক্ষকে পিপল-বৃক্ষ বলা হয়।

পরম্পরা মতে বিশ্বাস করা হয় যে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ যেদিন লুম্বিনী-কাননে জন্মেছিলেন ঠিক ঐদিন এ অশ্বত্থ-বৃক্ষেরও এখানে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল। এটি ছাড়া আর যে ছয়টি প্রাণী বা বস্তু কপিলাবস্তুর বিভিন্ন স্থানে জন্মেছিল ওসব হচ্ছে—বাল্যবন্ধু কালুদায়ী, অশ্ব কন্থক, সারথী ছন্দক, রাহুল-মাতা যশোধরা, আর চারটি নিধিকুম্ভ। শেষ চারটি নিধিকুম্ভ উৎপন্ন হয়েছিল রাজা শুদ্ধোদনের রাজ-প্রাসাদের চার পাশে।

(ক) বোধি-মণ্ডপ ঃ

বোধিবৃক্ষের নীচে যে জায়গায় তৃণহারক সোত্থিয়ের দেওয়া তৃণ বিছিয়ে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ বসে বজ্র-সঙ্কল্প নিয়েছিলেন এবং শেষে সহস্র বাহু ও বিবিধ বলবাহিনী সম্পন্ন মারকে পরাভূত করেছিলেন সেটিকে বোধিমণ্ডপ বলা হয়। যে পদ্ম-আসনে বা মুদ্রায় বসে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ মার বিজয়ের মাধ্যমে বুদ্ধ হয়েছিলেন তাকে বজ্রাসন, অপরাজিত পালঙ্ক, বোধিপালঙ্কও বলা হয়ে থাকে।

এখানে পৌঁছে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ বোধিবৃক্ষের চারিদিকে পরিক্রমা করেছিলেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল—কোন্ দিকে মুখ করে বসাটা উচিত হবে তা জানা। শেষে তাঁর পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের পরম্পরাকে জানলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই পূর্বাভিমুখী হয়ে ধ্যানাসন গ্রহণ করেছিলেন। তা জেনে তিনিও পূর্বাভিমুখী হয়ে অর্থাৎ বোধিবৃক্ষের দিকে পিঠ করে বসেছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে এক সপ্তাহ ঐ স্থানে ঐ আসনে বসে বিমুক্তি-সুখ উপভোগ করেছিলেন।

ভূমিকম্প-এ বজ্রাসন ছাড়া সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিল। তাই এ বজ্রাসনকে অপ্রকম্পিত স্থানও বলা হয়।

বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে জানা যায় পৃথিবী সৃষ্টির সময় এ আসনটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংসের সময় সবশেষে গিয়ে ধ্বংস হয়। এখানেই অতীতের সব বুদ্ধগণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতের সব বুদ্ধগণও এখানে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। এ কারণে এ স্থানকে অপরিবর্তনীয় স্থানও বলা হয়।

বুদ্ধের বাণী যখন এ পৃথিবী থেকে চিরতরে লোপ পাবে এবং পৃথিবীও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যাপ্ত বুদ্ধের সমস্ত ধাতুগুলো অলৌকিক ঋদ্ধি-শক্তির প্রভাবে ধর্মতা গুণে এখানে এসে একত্রিত হবে আর বুদ্ধরূপ ধারণ করে ছাই হয়ে যাবে। তাই বোধিমণ্ডপকে বুদ্ধ-শাসনের অন্তর্ধান-স্থানও বলা হয়।

বোধি-মণ্ডপে বোধিলাভের এ প্রক্রিয়া কখন হতে চলে আসছে তা সঠিকভাবে কেহ বলতে পারে না। যেহেতু প্রত্যেক বোধিসত্ত্বকেই তাঁর সম্বোধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মগধরাজ্যের নিরঞ্জনা নদীর তটবর্তী উরুবেলা গ্রামে জাত এক অশ্বত্থ-বৃক্ষ-তলে বসেই মার-বিজয়ী হতে হবে, ত্রি-ভূবনে এ উরুবেলা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় স্থল নেই যেখানে কোন এক বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন, তাই বোধিমণ্ডপকে অদ্বিতীয় ও অপরিবর্তনীয় স্থান রূপে বর্ণনা করা হয়।

এভাবে এক বোধিসত্ত্বের বোধিমণ্ডপে আসা আর সম্বোধি (সর্বজ্ঞতা) প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই বোধিমণ্ডপের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না। এক বুদ্ধ-কালের পর পরবর্তী বুদ্ধ-কালের ভাবী বুদ্ধের (বোধিসত্ত্ব) আগমনের এবং তাঁর সম্বোধি-প্রাপ্তির অমূল্য ক্ষণের প্রতীক্ষা তাঁকে করতে হয়। এভাবে চলে এক অনন্ত-কালীন শৃঙ্খলা।

এক বুদ্ধের কল্পকাল ফুরিয়ে এলে এক বুদ্ধান্তর কল্পকাল আসে। তা ফুরিয়ে এলে আসে আরেক বুদ্ধকাল। কাজেই এক বুদ্ধান্তর কল্পকাল পর এক দীর্ঘকালীন শূন্যতা বিদ্যমান থাকে। এ প্রক্রিয়ার শেষে যখন এক মানব-কূলে বোধিসত্ত্বের (ভাবী বুদ্ধ) আবির্ভাব হয়, তখন তাঁকে মহাভিনিষ্ক্রমণের পর উরুবেলার বোধিমণ্ডপে পৌঁছানোর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমান থাকতে হয়।

(খ) অনিমেষ চৈত্য ঃ

বোধিবৃক্ষের উত্তর-পূর্ব কোণে এক স্থানে চোখের পলক না ফেলে এক নাগাড়ে এক সপ্তাহকাল বোধিবৃক্ষের প্রতি তাকিয়ে থেকে শাস্তা তাঁর অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন। পালি সাহিত্যে বুদ্ধ-সেবিত এ স্থানটিকে অনিমেষ স্থান বলা হয়। স্থানটি বুদ্ধের জীবনের সাথে জড়িত থাকায় একে অনিমেষ-চৈত্যও বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে মহাবোধি মন্দিরের অনুকরণে এখানে একটি দর্শনীয় মন্দির তৈরি করা হয়।

(গ) চংক্রমণ-চৈত্য ঃ

বোধিবৃক্ষ (বোধিমণ্ডপ) হতে উত্তর-পূর্ব দিকে অনিমেষ- চৈত্যের মাঝামাঝি স্থানে শাস্তা সুগত বুদ্ধ চংক্রমণ (স্মৃতি সহকারে পায়চারী) করেছিলেন। পরম্পরা মতে বিশ্বাস করা হয় তিনি এখানে ঊনিশটি পদক্ষেপ ফেলে পূর্বদিকে এগিয়েছিলেন এবং পেছনে ফিরে এসেছিলেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে এক সপ্তাহকাল স্মৃতি-সহকারে পায়চারী করেছিলেন। এও বিশ্বাস করা হয় যে, প্রতিটি পদক্ষেপ রাখার পূর্বে মাটি হতে পদ্মফুল ফুটে উঠেছিল। এভাবে ক্রমান্বয়ে তিনি সপ্তাহকাল চংক্রমণ করেছিলেন।

(ঘ) রত্ন-ঘর ঃ

বোধিবৃক্ষের ঠিক উত্তরদিকে অবস্থিত এক ঘরে ভগবান বুদ্ধ তাঁর চতুর্থ সপ্তাহ পুনরায় ধ্যানে কাটান। ধ্যানের গভীর হতে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করেন। এর পর অভিধর্মের সাতটি প্রকরণের (ধর্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, কথাবস্তু, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি, ধাতুকথা, যমক, প্রস্থান)-এক-একটির ব্যাপারে পৃথকভাবে চিন্তন-অনুচিন্তন করেন। প্রথম ছয়টির চিন্তন-অনুচিন্তনকালে শাস্তা সুগত বুদ্ধের শরীর হতে কোন প্রকারের অলৌকিক রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়নি। কিন্তু সপ্তম বা শেষ প্রকরণ অর্থাৎ প্রস্থান (পট্ঠান)-এর অনুলোম-প্রতিলোম আকারে (জীবনের প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির সূক্ষ্মতম হতে ব্যাপকতর প্রভাব এবং দুঃখ-সমূহের উৎপত্তি ও সমূল বিনাশ) পারমার্থিক তত্ত্বকথার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন, ঠিক তখন শাস্তার দেহ হতে লাল, নীল, হলুদ, মঞ্জেষ্ট, সাদা এবং এ পাঁচে মিশ্রিত এক দিব্য ইন্দ্রধনুষী আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। এতে শাস্তার দেহের চার পাশে এক দিব্য ও অদ্ভুত আভামণ্ডল তৈরি হয়েছিল। শাস্তার কাঞ্চনবর্ণময় দেহ একেবারে রত্নতুল্য হয়ে উঠেছিল। এর প্রভাবে ঐ কুটিও রত্নতুল্য হয়েছিল। বস্তুত ঐ কুটিটি মোটেই রত্নখচিত ছিল না। একারণে পালি সাহিত্যে একে রত্ন-ঘর বলা হয়েছে আজ এখানে ইটের তৈরি ছোট ঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বুদ্ধের সময় সেখানে কোন প্রকারের পাকা ঘর না থাকলেও সেখানে যে সামান্য একটি কুটি ছিল তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

(ঙ) অজপাল-বৃক্ষ ঃ

তথাগত গৌতম বুদ্ধ চতুর্থ সপ্তাহের পর বোধিবৃক্ষের ঠিক পূর্বদিকে এক বটবৃক্ষমূলে বসেছিলেন। সেখানেও পরবর্তী সপ্তাহ এক নাগাড়ে বিমুক্তি-রস-সেবনে লীন ছিলেন। পালি সাহিত্যে এ বটবৃক্ষ অজপাল-বৃক্ষ-রূপে চর্চিত হয়েছে। এ বৃক্ষটি বিশালাকারের হওয়ায় এর দ্বারা ছিল অতি ঘন ও সুশীতল। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নকালীন প্রখর তাপদাহজনিত ক্লান্তি দূর করতঃ পথশ্রান্ত অজ-রা (ছাগল)-এ গাছের নীচে বসত। তাই এর ঐ নাম হয়েছিল। যেন ঐ বৃক্ষটি পথ-শ্রান্তদের বিশেষতঃ অজদের (ছাগ) পালনের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিল। সবার জানা যে অজ-রা গৃহস্থজনদের পালিত পশু হয়ে থাকে। এ ঘটনা হতেও উরুবেলার আশেপাশে বসত-ভিটে হবার স্পষ্ট সঙ্কেত মেলে।

এ বৃক্ষমূলে বিমুক্তিসুখ উপভোগে তল্লীন থাকা কালে হুহুক্কু গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। শাস্তার কাছে তিনি জানতে চান— কে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ? মানুষ কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারে?

উত্তরে শাস্তা বলেন—অস্মিমানকে যিনি পরিপূর্ণভাবে উন্মূলন করতে সমর্থ তিনি সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। শাস্তা আরও বলেছিলেন— কেবল জটা, গোত্র কিংবা জন্মসূত্রে কেহ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। যিনি বাক্য ও কর্মে উভয় দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ, অহিংসা, ক্ষান্তি ও সংযমী হবার তপস্যা করেন তিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জনে সমর্থ হন।

(চ) মুচলিন্দ ঃ

ভগবান বুদ্ধ পঞ্চম সপ্তাহের পর বোধিবৃক্ষের সরাসরি দক্ষিণ পাশে কিছু দূরে এক বড় জলাশয়ের কাছে যান। ঐ জলাশয়ের নাম ছিল মুচলিন্দ পুকুর। কারণ ঐ পুকুরে মুচলিন্দ নামে

এক নাগরাজ থাকতেন। ঐ পুকুরের পাশে কোন এক স্থানে বসে সপ্তাহকাল ক্রমান্বয়ে শাস্তা সুগত বুদ্ধ বিমুক্তি-সুখ উপভোগ করছিলেন।

বৈশাখ মাস হওয়ায় হঠাৎ অকাল-মেঘ দেখা দিয়েছিল। ঐ ভয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝায় ও শীত-আতপে যাতে বুদ্ধের বিমুক্তি-সুখ উপভোগ কোন প্রকারে বিঘ্নিত না হয়—এ চিন্তায় নাগরাজ মুচলিন্দ ঐ পুকুরস্থ বাসভবন হতে বেরিয়ে আসেন। শাস্তা সুগত বুদ্ধের চার পাশ নিজ শরীর দিয়ে বেষ্টন করেন এবং শাস্তার মাথার উপরে নিজের ফণা বিস্তার করে ছাতার আকারে ঝড়-ঝঞ্ঝার ঘাত-প্রতিঘাত হতে শাস্তাকে রক্ষা করেন। সপ্তাহ শেষে অকাল-মেঘে বিদূরিত হলে ঐ নাগরাজ নিজে নাগরূপ ছেড়ে মানব-রূপে করজোড়ে বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়ান। নাগরাজের ঐভাবে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য জানতে পেরে শাস্তা তাঁকে জ্ঞানবর্ধক ও শান্তিদায়ক এক সংক্ষিপ্ত উদান গাথা উচ্চারণ করেছিলেন। শাস্তার উপদেশ শেষ হলে ঐ মুচলিন্দ নাগরাজ শাস্তাকে করজোড়ে প্রদক্ষিণ করেন এবং মানবরূপ ত্যাগ করে নিজে নাগরূপ ধারণ করে মুচলিন্দ পুকুরস্থ নিজ বাসভবনে ফিরে যান। এভাবে এখানে শাস্তা সুগত বুদ্ধের ষষ্ঠতম সপ্তাহ অতিবাহিত হয়।

(ছ) রাজায়তন-বৃক্ষ ঃ

এটি 'রাজা' ও 'আয়তন' দু'টি শব্দের সংযোগে সৃষ্ট একটি যৌগিক শব্দ। 'রাজা' শব্দের প্রয়োগ কখনও দলপতি, গণপতি, নৃপতি, দেশের অধিপতি ইত্যাদি অর্থে হয়। আবার কখনও তা বিশাল, বিরাট বা শ্রেষ্ঠ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। 'আয়তন' একটি বহু-অর্থক শব্দ, যেমন স্থান, যজ্ঞস্থান, আলয়, দেবাদি বন্দনা-অর্চনাদির স্থান, তীর্থ-স্থান ইত্যাদি। আবার কখনও এটি বিস্তার, পরিসর, পরিমাণ আদি অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কাজেই রাজায়তন শব্দটিরও বহু-অর্থ তো হবেই। তা সত্ত্বেও এর সামান্য অর্থটি হল বিশাল বা শ্রেষ্ঠ আয়তন বা বিশাল পরিসর।

পালি সাহিত্যে যে প্রসঙ্গে 'রাজায়তন' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে কোন নৃপতি বা নরাধিপতির কোন ভূমিকা ছিল না। সেখানে 'রাজায়তন' শব্দটি এক বিশাল আয়তন-এর ভাব বোধক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এর গভীরে গেলে 'বিশাল আয়তন' কিসের?—অর্থটি স্পষ্ট হয়।

সপ্তম সপ্তাহে মুচলিন্দ পুকুরে ও বোধিবৃক্ষের (বর্তমান মহাবোধি মন্দিরের) মাঝামাঝি এলাকায় এক বৃক্ষ-তলে বসে ভগবান বুদ্ধ আবার বিমুক্তি-রস-সেবনে মগ্ন হন। খুব সম্ভবত পুরানো হওয়ায় এ বৃক্ষের মধ্যাহ্নকালীন ছায়াকে বেশ বিশাল এলাকা জুড়ে থাকতে দেখে মনে হতো আশে-পাশের বন্য বৃক্ষগুলোর মধ্যে ওটি যেন এক বৃক্ষাধিপতি। তাই বোধ হয় তখনকার লোক-সমাজে ঐটি রাজায়তন নামে পরিচিত হয়েছিল।

ক্রমান্বয়ে সাতদিন বিমুক্তি-রস-সেবনে মগ্ন হয়ে ভগবান বুদ্ধ এ রাজায়তন বৃক্ষমূলে

কাল কাটিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সপ্তম সপ্তাহের সপ্তমদিন এসে পড়ে। তখন উৎকল (উক্কল) জনপদ হতে দু'জন ব্যবসায়ী পণ্য-সামগ্রীতে ভরা নিজ নিজ পাঁচশ গরুগাড়ী নিয়ে গয়ায় এসেছিলেন। গয়ার কাজ শেষ করে এবার তাঁরা উরুবেলা হয়ে অন্য কোথাও যাবার জন্যে এগিয়েছিলেন। ঐ দু'জনই ছিলেন সহোদর ভাই। একজনের নাম ছিল তপস্‌সু। আর অপর জনের নাম ছিল ভল্লিক।

উরুবেলাস্থ বোধিবৃক্ষের কিছু দূরে পৌঁছতেই ঐ দু'ভাইয়ের গরুগাড়ী হঠাৎ পথে আপনা-আপনি থেমে যায়। আগের গাড়ী থেমে যাওয়ায় পরবর্তী সব গাড়ী একে একে থেমে যায়। এদিকে দু'ভাইয়ের গরুগাড়ীর চালকেরা অনেক হাঁকাহাঁকি করার পরও গাড়ী নড়ছে না দেখে, গাড়ী থেকে তাঁরা নেমে আসেন। একে অপরের কাছে এক কারণ জানতে চান। পুরোগামী গরুগাড়ী চালকেরা নিজ নিজ গরুর পিঠে মৃদু স্পর্শ করে এগিয়ে যাবার সঙ্কেত দেয়। সব চেষ্টাই তাঁদের ব্যর্থ যায়। তা দেখে তাঁরা এবার গাড়ীর চাকায় হাত দিয়ে চাকা নাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তবুও গাড়ীর চাকা একটুও নড়ল না। যেন চাকাগুলো মাটিতে গেড়ে বসে আছে।

এ অদ্ভুত ঘটনা দেখে ঐ দু'ভাই সহ অন্য চালকেরা হতবাক হয়ে পড়েন। এভাবে হঠাৎ অকারণে তাঁদের গাড়ী থেমে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন।

ঠিক ঐ সময় ঐ দু'ভাই এক আকাশবাণী শুনতে পান। আকাশবাণীটি ছিল এরূপঃ "হে বন্ধুগণ! এখান হতে কিছু দূরে তথাগত বুদ্ধ সাতদিন যাবৎ এক বিশাল বৃক্ষ-তলে বসে বিমুক্তি-রস-সেবনে রত আছেন। এর পূর্বে সুজাতার প্রদত্ত ক্ষীরান্নের ঊনপঞ্চাশ গ্রাস খেয়ে বোধিবৃক্ষের তলে বসে আর মার-*মর্দন* করে তিনি বুদ্ধ (সর্বজ্ঞ) হন। বোধি-বৃক্ষ ছাড়া অপর ছয় জায়গায় ছয় সপ্তাহ কাটান। পাশাপাশি আজ তাঁর সপ্তম সপ্তাহের সপ্তম দিন অর্থাৎ শেষ দিন। ঊনপঞ্চাশ দিন নির্জলা ও নিরাহার থাকায় তিনি নিশ্চয়ই আজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হবেন। পুণ্যার্জনের এ হল সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। এখুনি তাঁর কাছে যাও। যা কিছু আছে তাঁকে দাও। তাঁর পূজা-সৎকার কর। এতে আমাদের সবার মহান পুণ্য হবে। তা আমাদের সবার দীর্ঘকালীন সুখের কারণ হবে।"

এত সব কথা জানার পর ঐ দু'ভাইয়ের মনে নানা রকমের চিন্তার উদয় হয়। এর পর আবার এক দৈববাণী শোনা যায়। এতে তাঁরা জানতে পারলেন—ঐ দৈববাণী এক দেবতার। ঐ দেবতা পূর্বজন্মে তপস্‌সু ও ভল্লিকের খুব নিকট আত্মীয় ছিল। তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করতে তপস্‌সু ও ভল্লিক অনেক উপকার করেছিলেন। মৃত্যুর পর ঐ আত্মীয় দেবপুত্র হন। দেবপুত্র হয়ে জন্মাবার কারণ খুঁজে দেখার প্রয়াসে তিনি জানতে

পারলেন ঐ দু'ভাইয়ের উপকারের কথা। তাঁর মনে কৃতজ্ঞতার ভাব উদয় হয়। তা নিয়ে চিন্তা করা কালে এক অতি উত্তম উপায় ভেবে পান। ঐ দেবতা জানতেন যে ভগবান বুদ্ধ প্রায় ঊনপঞ্চাশ দিন কোন প্রকারে স্থূল আহার না নিয়ে এমন কি কোন প্রকার পেয় পদার্থও সেবন না করে কেবল মাত্র বিমুক্তি-রস সেবনের শক্তিতেই কাটিয়েছেন। তিনি এও জানতেন—আজ প্রাতেই ভগবান বুদ্ধ ধ্যানাসন হতে স্বাভাবিক জীবন শৈলীতে ফিরে আসবেন। এমন পরিস্থিতিতে ভগবান বুদ্ধ নিশ্চয়ই ভীষণ ক্ষুধার্ত ও *পিপাসার্ত* হয়ে থাকবেন। ঐ দু'ভাইয়ের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারলে অন্নদান ও আমার প্রভূত পুণ্য সঞ্চিত হবে। ঐ পুণ্য আমাদের অনাগত কালের হিত-সুখের কারণ হবে।

দেবতার এ পরামর্শ ঐ দু'ভাইয়ের মনঃপূত হল। তা ছাড়া এ পরামর্শ না মেনে অন্য কিছু করার যে উপায় ছিল না। তাই *অনন্যোপায়* হয়ে তাঁরা দু'ভাই সাথে সাথে কিছু পরিমাণের মধু ও পিঠে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেন। এক বৃক্ষের নীচে দিব্য আভামণ্ডিত ও সুলক্ষণ সম্পন্ন এক সন্ন্যাসীকে দেখেই বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এ সে'ই গৌতম বুদ্ধ যার কথা ঐ দেবতা বলেছিলেন।

আর কালক্ষয় না করে ঐ দু'ভাই প্রণাম নিবেদন করে বলেন—"ভগবান, আমাদের এ যৎসামান্য মধু ও পিঠে গ্রহণ করে আমাদেরকে অনুগৃহীত করুন। এতে আমাদের অনাগত কালের চিরবাঞ্ছিত হিত-সুখ প্রাপ্তির কারণ হবে।"।

ভগবান মনোকামনা বুঝে এবং মৌনভাব ধারণ করে তাঁদের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণের স্বীকৃতি দেন। তবে ভগবান বুদ্ধ চিন্তা করতে থাকেন এ খাদ্য গ্রহণ করবেন কিসে? খালি হাতে খাদ্য গ্রহণ করাটা তো শোভা পায় না। তখন তিনি ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগে জানতে পারেন অতীতের বুদ্ধগণ কখনও খালি হাতে খাদ্য গ্রহণ করেন নি, তখনই ভগবান বুদ্ধের মনের কথা জানতে পেরে চার লোকপাল দেবতা চারদিক্ হতে চার খানা অতি মূল্যবান পাথরের তৈরি পাত্র নিয়ে আসেন। কাকে ছেড়ে কারটা নেবেন—এ এক দুশ্চিন্তা। বুদ্ধগণ কখনও কাউকে অকারণে অপ্রসন্ন করেন না। বুদ্ধ তা সে'ই অতীতের বা অনাগতের বা বর্তমানের হোক না কেন কখনই এমন কোন কাজ করেন না, যার কারণে কারোর শ্রদ্ধার পরিহানি হয়। তাই মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ তার লোকপাল দেবতার আনীত চারটি পাথরের পাত্রই গ্রহণ করেন। আর ঐ চারটি পাত্রকেই একটির উপর একটি রাখেন। আশ্চর্যজনকভাবে ঐ চারটি পাত্র মিলে-মিশে ক্ষণিকের মধ্যে একটিতে পরিণত হয়। তখন ঐ পাত্রে ভগবান বুদ্ধ তপস্সু-ভল্লিকের প্রদত্ত মধু ও পিঠে গ্রহণ করেন। এর পর শাস্তার আশীর্বাদ পেয়ে মহানন্দে ঐ চার লোকপাল দেবতা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান।

এরপর পাশে বসা তপস্‌সু ও ভল্লিককে সম্বোধন করে বুদ্ধ এক সংক্ষিপ্ত উপদেশ দেন। তা শুনে মুগ্ধ হয়ে শাস্তার কাছে শরণাগত উপাসকরূপে মেনে নেবার বিনম্র নিবেদন জানায়। শাস্তা এতে স্বীকৃতি দেন। সঙ্ঘ তখনও প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাঁরা বুদ্ধ ও ধর্মেরই শরণাপন্ন হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা দু'জন বৌদ্ধবিশ্বে সর্বপ্রথম দ্বিশরণাগত উপাসক হবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।

এর পর ঐ দু'ভাই, তপস্‌সু ও ভল্লিক, ভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রার্থনা করেন—"ভগবান, আমাদের উভয়ের অনাগত কালের হিত ও সুখ কামনায় এবং বহুজনের হিতার্থে ও সুখার্থে এ সাক্ষাতের স্মারক কিছু দিন"।

শাস্তা সুগত বুদ্ধ তাঁদের মনোকামনা পূরণার্থে মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু চুল (নিজের কেশধাতু) তাঁরা দু'জনের হাতে তুলে দেন। এর পর তাঁরা দু'জন স্বদেশে ফিরে যান।

নিরঞ্জনার তীরবর্তী উরুবেলার উপরোক্ত সাতটি স্থান শাস্তা সুগত বুদ্ধের প্রারম্ভিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৌদ্ধ সাহিত্যে ও বিশ্ব বৌদ্ধ জগতে এ সাতটি স্থানকে "সপ্তমহাপুণ্যস্থান" রূপে অতি চর্চিত। বৌদ্ধদের কাছে তা অতি বন্দিত।

বিশ্বের প্রায় স্থবিরবাদী বৌদ্ধই যারা উরুবেলায় (বর্তমান বুদ্ধগয়া) এসেছেন বা আসতে পারেন নি, বা যারা বুদ্ধগয়ার ব্যাপারে অপরের কাছে শুনেছেন তাঁরা দিনে অন্তত একবারের জন্যে হলেও নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করে নিজেকে পুণ্যময় করতে ভুলে না।

পঠমং বোধিপল্লঙ্কং, দুতিয়ং অনিমিসম্পি চ,
ততিয়ং চঙ্কমনং সেট্‌ঠং, চতুত্থং রতনঘরং।
পঞ্চমং অজপালং চ মুচলিন্দেন ছট্‌ঠমং;
সত্তমং রাজায়তন বন্দে তং বোধিপাদপং।

৩. বুদ্ধের ধর্মাভিযান

৩.১. বুদ্ধের সারনাথ গমন ও ধর্মচক্র প্রবর্তন ঃ

উরুবেলায় বুদ্ধত্ব লাভ করার ঊনপঞ্চাশ দিন পর শাস্তা সুগত বুদ্ধ উরুবেলা হতে গয়া হয়ে সারনাথ যান। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পঞ্চবর্গীয় ঐ পুরাণো ব্রাহ্মণ শিষ্য দূর হতে আসতে দেখেই তাঁকে পূর্ববৎ আদর আপ্যায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাঁরা নিজ নিজ সঙ্কল্পে অটুট থাকতে পারেন নি। শাস্তা সুগত বুদ্ধ যেমন যেমন তাঁদের দিকে এগোন তেমন তেমন তাঁরা উঠে এসে আসন দিয়ে 'আসুন-বসুন' বলে অজান্তে পূর্ববৎ ব্যবহার করতে থাকেন।

সেখানে শাস্তা সুগত বুদ্ধ তাঁর সাধনালব্ধ গভীর জ্ঞানের প্রথম উপদেশ দেন। তা ধর্মচক্রপ্রবর্তনরূপে বৌদ্ধ সাহিত্যে অতি খ্যাত। শাস্তা সুগত বুদ্ধ শেষে ঐ উপদেশ শোনান। কৌণ্ডিণ্য তা শুনে অর্হৎ হন। অন্য চারজনকে দুবারে আবার শোনান। অপর চারজনেরও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়। এরপর অনত্ত-লক্খণসুত্তং-এর উপদেশ শোনান। সকলে অর্হৎ হয়ে পড়েন।

শাস্তা সুগত বুদ্ধ ও অন্য পাঁচজনকে নিয়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরবর্তী পর্য্যায়ে অর্হৎ ভিক্ষুদের সংখ্যা একষট্টিজন হয়। শাস্তা শেষে সকলকে তাঁর ধর্ম প্রচারের এবং ভিক্ষু করানোর অধিকার বিকেন্দ্রীকরণ করে নির্দেশ দেন "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা একপথে দু'জন না গিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। এমন ধর্মের প্রচার কর যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তেও কল্যাণ সাধিত হয়"। একথা বলে শাস্তা এক বারাণসী হতে পুনরায় উরুবেলায় আসেন। আসার পথে তিনি নানা স্থানে নানা ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন।

৩.২. দ্বিতীয়বার উরুবেলায় আগমন ও কাশ্যপ ভ্রাতৃত্রয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ ঃ

বুদ্ধ বারাণসী হতে দ্বিতীয়বার উরুবেলায় আসেন তবে বোধিমণ্ডপে যান নি। তিনি যান উরুবেলা-কাশ্যপের আশ্রমে। উরুবেলা-কাশ্যপেরা তিন ভাই। অপর দুই ভাই হল নদী-কাশ্যপ ও গয়া-কাশ্যপ। উরুবেলা-কাশ্যপ তাঁদের মধ্যে বড়। নদী-কাশ্যপ হল মধ্যবর্তী আর সবার ছোট হলেন গয়া-কাশ্যপ। এরা কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারে জাত। তাঁরা ছিলেন সবাই অগ্নি-হোত্রী। এ তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাইয়ের শিষ্য-সংখ্যা ছিল পাঁচ'শ। নদী-কাশ্যপের শিষ্য-সংখ্যা ছিল তিন'শ। আর গয়া-কাশ্যপের শিষ্য-সংখ্যা ছিল দু'শ।

এদের মধ্যে উরুবেলা-কাশ্যপের আশ্রম ছিল উরুবেলায়। নদী-কাশ্যপ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে উরুবেলা ও গয়ার মাঝামাঝি কোথাও থাকতেন। আর ছোটভাই গয়া-কাশ্যপ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকতেন খুব সম্ভবত গয়া শহরের কাছাকাছি। এ তিনজন ঋদ্ধিমান ছিলেন। তাঁদের অহঙ্কার ছিল—আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমগ্র মগধ জনপদে তাঁদের সমকক্ষ আর কেহ নেই। তাই শাস্তা সুগত বুদ্ধ ভাবলেন—এদের অন্তরে ধর্মচক্ষু উৎপন্ন না করে মগধে ধর্মপ্রচার করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই শাস্তা সুগত বুদ্ধ সারনাথে থাকা কালে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি উরুবেলায় পৌঁছে উরুবেলা-কাশ্যপের কাছে যান। উরুবেলা-কাশ্যপের আশ্রমে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়।

শাস্তা গিয়ে উরুবেলা-কাশ্যপকে বললেন—বন্ধুবর! এক রাতের জন্য আমাকে আপনার আশ্রমে থাকতে দিন। উরুবেলা-কাশ্যপ তাঁর সাথে না রেখে এক পরিত্যক্ত অগ্নি (যজ্ঞ)-শালায় বুদ্ধের থাকার ব্যবস্থা করেন। তবে বুদ্ধকে সচেতন করে দিয়ে বলেন—ঐ অগ্নিশালায় এক বিষধর নাগরাজ থাকেন। বুদ্ধ বললেন— হে উরুবেলা-কাশ্যপ! ঐ নাগরাজ আমার কোন ক্ষতি করবে না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

উরুবেলা-কাশ্যপের কিছু শিষ্য বুদ্ধকে ঐ অগ্নিশালায় নিয়ে যায়। ঐ অগ্নিশালায় প্রবেশ করতেই সেখানে থাকা নাগরাজ আপন রূপ নিয়ে বেড়িয়ে আসে। ধর্মরাজ বুদ্ধ ও সর্পরাজ নাগ—এ দুই রাজার মধ্যে সারারাত ধরে চলে তুমুল লড়াই। সর্পরাজ নাগ নিজেকে তেজোদ্দীপ্ত করলে ধর্মরাজ বুদ্ধও নিজেকে তার চেয়ে অধিক তেজোদ্দীপ্ত করতেন। এভাবে ও দু'য়ের তেজময় দীপ্তিতে ঐ অগ্নি (যজ্ঞ) শালা ভেতরে-বাইরে লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে উরুবেলা-কাশ্যপের আশ্রমবাসীরা এসে ঐ অগ্নি (যজ্ঞ) শালায় চারদিকে ঘিরে থাকেন। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল-শ্রমণ গৌতম বুদ্ধ বোধ হয় মারা গেছেন। ভোর হলে সুগত বুদ্ধ একটা পাত্রে ঐ নাগরাজকে পুড়ে বাইরে নিয়ে আসেন এবং আশ্রমবাসীকে নির্দেশ দেন একে বাইরে কোথাও ছেড়ে আসার। এ ঘটনা দেখে তাঁরা মানতে বাধ্য হন যে এ গৌতম বুদ্ধ যেমন তেমন সন্ন্যাসী নন। ইনি একজন অসাধারণ সন্ন্যাসী। তা না হলে তাঁদের গুরু এতদিন এ নাগরাজকে দমন করেন নি কেন? শাস্তা সুগত বুদ্ধের সম্বোধি যে কত গভীর তা বোঝার ক্ষমতা তাঁদের কারোরই নেই। কেবল ঋদ্ধিশক্তির ক্ষমতা দেখেই তাঁর শ্রামণ্যত্বের আভাস পাওয়ার প্রয়াস তারা করতে থাকেন। উরুবেলা-কাশ্যপও ভাবলেন—যে নাগরাজকে আমি দমন করতে পারি নি, তাঁকে তিনি একাই দমন করতে পেরেছেন। এ বার্তা সারা মগধে ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই এ বার্তা জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই যদি আমরা সদলবলে শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব বরণ করি, তাতেই আমাদের অধিক মঙ্গল। এমন ভেবে উরুবেলা-কাশ্যপ ও তাঁর পাঁচ'শ শিষ্যের সবাই *জটা-বল্কল*, মৃগচর্ম ও আশ্রমের সব সামগ্রী নৈরঞ্জনা নদীর জলে ভাসিয়ে মাথা মুড়িয়ে গৈরিকবস্ত্র পরিধান করে ভগবান বুদ্ধের গৃহত্যাগী শিষ্য (ভিক্ষু) হন।

এভাবে বড়ভাই ও তাঁর শিষ্যদের ভাসিয়ে দেওয়া জটা, বল্কল, মৃগচর্ম ও আশ্রমের খড়কুটো নিরঞ্জনার জলে যাচ্ছিল নদীকাশ্যপের আশ্রমের পাশ দিয়ে তা যেতে দেখে নদী-কাশ্যপের শিষ্যরা মনে করেন হয়ত উরুবেলা-কাশ্যপের আশ্রমে বন্যা বা ঐ ধরনের অন্য কোন অঘটন ঘটেছে। এ কথা মনে করে নদী-কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যরা উরুবেলা-কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যদের অনুসন্ধানে উরুবেলায় আসেন। তাঁদের আশ্রমাদি না দেখে তাঁরা চকিত হন। শেষে উরুবেলা-কাশ্যপ ও তাঁর পাঁচশ শিষ্যকে মাথা নেড়া ও পীতবস্ত্রধারী অবস্থায় বুদ্ধ-সান্নিধ্যে দেখে একবারে হতবাক হয়ে পড়েন। শেষে সব কথ শুনে তাঁরাও তৎক্ষণাৎ মাথা মুড়িয়ে চীবরধারী হয়ে পড়েন এবং আশ্রমে গিয়ে সব *নিরঞ্জনা* নদীর জলে ভাসিয়ে দেন।

এভাবে নদী-কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সব সামগ্রীকে গয়া-কাশ্যপের আশ্রমের পাশ দিয়ে ভেসে যেতে দেখে গয়া-কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যগণ অনুরূপভাবে ভাবেন—হয়ত নদী-কাশ্যপের আশ্রমে কোন দুর্ঘটনা হয়েছে। তাঁদের কাছে গিয়ে একটু সাহায্য করে আসি-ভেবে নদী-কাশ্যপের আশ্রমের কাছাকাছি আসেন। আশ্রম না দেখে তাঁরাও হতবাক হয়েছিলেন। শেষে নদী-কাশ্যপ, উরুবেলা-কাশ্যপ ও তাঁদের দুই ভাইয়ের শিষ্যদের মুণ্ডিতমস্তক ও গৈরিকবস্ত্রধারী হয়ে বুদ্ধ-সান্নিধ্যে দেখে তাঁরা হতচকিত হন। শেষে গয়া কাশ্যপও সশিষ্যবৃন্দ পরামর্শ করে বুদ্ধ সান্নিধ্যে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁরাও নিজ আশ্রমে এসে আশ্রম ভেঙ্গে চুড়মার করে নিরঞ্জনা নদীতে ভাসিয়ে দেন।

শাস্তা সুগত বুদ্ধ প্রথম বর্ষাবাস সারনাথে কাটিয়ে উরুবেলায় এসেছিলেন। বর্ষাবাস শেষ হয় সাধারণত আশ্বিন-কার্তিক মাসে। নিরঞ্জনা নদীতে তখন অবশ্যই জল ছিল, তা না হলে কাশ্যপ ভাই তিনজন এবং তাঁদের হাজার শিষ্যগণের জটা, বল্কল, মৃগচর্ম ও তিনটি আশ্রমের খড়কুটো ও গাছ-বাঁশ আদি উরুবেলা থেকে গয়া অবধি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতো কি?

৩.৩. গয়াশীর্ষ ও আদিত্য-পর্যায় সূত্র দেশনা ঃ

উরুবেলায় বা অন্যত্র কোথাও কোন বিশেষ সূত্রের উপদেশ না দিয়ে শাস্তা তাঁদের সবাইকে নিয়ে গয়াশীর্ষে যান এবং আদিত্য পর্য্যায় নামক এক বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় শ্রোতাদের মানসিক অবস্থার কথা জেনে তাঁদের মনোদশা অনুসারে ধর্মোপদেশ দেন। উরুবেলা-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ ও গয়া-কাশ্যপ এ তিন ভাই এবং তাঁদের শিষ্যগণের প্রত্যেকে অগ্নি-পূজারী ছিলেন। অগ্নিকে দেবতারূপে পূজা দিয়ে তাঁর বর পাওয়ার প্রত্যাশা করতেন। শরীরের অভ্যন্তরভাগে যে আগুন (তেজোধাতু) রয়েছে তা তো তাপ দেয়ই, সম্যক্ দৃষ্টিতে জানা হলে তা বিশুদ্ধি ও বিমুক্তি দানেও সমর্থ হয়। তাই ঐ অগ্নি বিষয়ক বিশেষ উপদেশ (আদিত্যপর্য্যায়) দিয়েছিলেন। ঐ উপদেশ শুনে তিন জটিল কাশ্যপভ্রাতা এবং তাঁদের একহাজার শিষ্য একসাথে অর্হৎ হন।

৩.৪. দ্বিতীয়বার রাজগৃহে গমন ও রাজা বিম্বিসারের দীক্ষা ঃ

এরপর তাঁদের নিয়ে শাস্তা সুগত বুদ্ধ মগধরাজ বিম্বিসারের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে রাজগৃহের দিকে পা বাড়ান। শাস্তা সুগত বুদ্ধ এক হাজার তিনজন অরহতকে (তিন প্রাক্তন জটাধারী কাশ্যপ ভ্রাতা ও তাঁদের এক হাজার শিষ্য) নিয়ে মগধের রাজধানী রাজগৃহের সীমান্তবর্তী পাহাড়ের নিকটস্থ এক সুপ্রতিষ্ঠিত-চৈত্যে বিহার করেন। তা জানতে পরে মগধরাজ বিম্বিসার সপরিবার ও সপারিষদ বুদ্ধ ও তাঁর অনুত্তর সঙ্ঘ-দর্শনে আসেন। শাস্তাকে মগধরাজ বিম্বিসার প্রমূখ অগণিত উপাসক-উপাসিকাকে তাঁদের মনোনুকুল এক ধর্মোপদেশ দেন। তা শুনে মগধরাজ বিম্বিসার স্রোতাপন্ন হন। পরিণামে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তাঁর হৃদয়ে অচলা-অটলা শ্রদ্ধা-ভক্তি উৎপন্ন হয়। তিনিও ত্রিশরণাগত উপাসক হন। সাথে তাঁর পরিবারের, রাজ-পরিষদের এবং ঐ ধর্মসভার উপস্থিত সবাই ত্রিশরণাগত উপাসক-উপাসিকায় পরিণত হন। ওঁদের অনেকে ভিক্ষু হন। মগধরাজ বিম্বিসার শাস্তা সুগত বুদ্ধকে সঙ্ঘ পরদিন পূর্বাহ্নে রাজপ্রাসাদে এসে পিণ্ডপাত গ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। শাস্তা তাঁর অনুরোধে মৌনভাব অবলম্বন করে স্বীকৃতি দেন।

পরদিন পূর্বাহ্নে শাস্তা সুগত বুদ্ধ সশিষ্যবৃন্দ মগধরাজ বিম্বিসারের রাজপ্রাসাদে যান। সেখানে মগধরাজ বিম্বিসার একজন স্রোতাপন্ন উপাসক হওয়ায় বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের সুখ-বিহারার্থে রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে স্থিত বেণুবনে (বাঁশঝাড়) ভরা রাজোদ্যানে একটি বিহার তৈরি করিয়ে বুদ্ধ-প্রমুখ আগত-অনাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের সুখ-বিহারার্থে দান করে বিশ্বে প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট উপাসক হবার দায়িত্ব পালন করেন। রাজ্যোদ্যানের বেণুঝাড়ের মধ্যে নির্মিত বলে ঐ বিহারটি 'বেণুবন-বিহার' নামে বৌদ্ধ সাহিত্যের বহুস্থানে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া এটিই হল

বিশ্বে প্রথম বুদ্ধবিহার। ত্রিশরণাগত একজন শ্রদ্ধাবান উপাসক ও শ্রদ্ধাবতী উপাসিকার প্রাথমিক কর্তব্য হল তাঁর ধর্মগুরুর আহার, সুখ-বিহার, চীবর (বস্ত্র) ও দুস্থ জীবন যাপনের ঔষধ-পথ্য প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করা। মগধরাজ বিম্বিসার আহার এবং বিহার দান করে এ দায়িত্ব প্রতিপালন করেছেন। তখন থেকে বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘ বহুবার বেণুবন-বিহারে দিন ও রাত এমন কি একাধিক বর্ষাবাস যাপন করেন।

রাজগৃহে সাথে বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। তবে রাজগৃহের অন্যান্য ঘটনা সমূহ এখানে অপ্রাসঙ্গিক ভেবে উল্লেখ করা হল না।

৪. নিরঞ্জনা শব্দের তাৎপর্য ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

৪.১. নিরঞ্জনা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও এর শব্দগত অর্থ ঃ

'অঞ্জনা' শব্দের পূর্বে 'নিঃ' (নি) উপসর্গ যোগে, 'নিরঞ্জনা' শব্দের সৃষ্টি। এখানে 'নিঃ' (নি) অভাবার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ 'অঞ্জনা' (বি স্ত্রীং) বা 'অঞ্জন' (বি ক্লীব)-এর অভাব। এ 'অঞ্জন' বা 'অঞ্জনা'-র অর্থ কি? এর অর্থ জানতে হলে মূল ধাতুর ব্যাপারে জানতে হয়। এর মূল ধাতু হল 'অঞ্জ'। 'অঞ্জ' ধাতুর অর্থ হল 'দিপ্তী পাওয়া' (অন্‌জ + অন্‌ট করণ বি; ক্লীব)।

অঞ্জন শব্দের অর্থ (১) মালিন্য, পাপ, কলঙ্ক। অর্থাৎ যা গতিশীল তা'ই 'অঞ্জন' আর যার গতি নেই তা 'নিরঞ্জন'। যা গতিশীলা তা'ই, 'অঞ্জনা' (বি স্ত্রী) আর যার অঞ্জনা (গতি) নেই তা 'তা নিরঞ্জনা' (বি স্ত্রী। (২) গমন, ব্যক্তকরণ, ম্রক্ষণ; অন্‌জ + অনট ভাব, বি স্ত্রী। যার বা যাতে কোন দোষ, কলঙ্ক, পাপ নেই তা 'নিরঞ্জন'। (৩) ব্যক্ত করণার্থেও 'অঞ্জন' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন ব্যঞ্জন। (৪) ম্রক্ষণঃ (ক) লেপন, মাখা, মিলানো, মিশানো। ম্রক্ষ্ (মাখা) + অন্‌ট ভাব। (খ) তৈল। ম্রক্ষ + অন্‌ট করণ 'বি'। যা অন্য কিছুতে মিশ্রিত তা ব্যঞ্জিত, যাতে অন্য কিছু মিশ্রণের ভাব রয়েছে তা 'অঞ্জন', আর যাতে কোন প্রকার মিশ্রণের কোন সম্ভাবনা নেই, তা হল 'নিরঞ্জন'। অন্যভাবে বলা যায় যা সংস্কৃত তা 'অঞ্জন' আর যা অসংস্কৃত তা হল 'নিরঞ্জন' (অলখ নিরঞ্জন)।

অঞ্জ ধাতু-নিষ্পন্ন নিরঞ্জন শব্দের অর্থগত প্রয়োগ নিম্নলিখিত তিনটি অর্থে করা যায়—(১) যার মাধ্যমে চক্ষু রঞ্জিত করা যায়, কাজল, মসি, রসাঞ্জন, দেবার্চনায় ব্যবহৃত ছ'প্রকার অঞ্জনের অন্যতম, মালিন্য, পাপ। (২) গমন; ব্যক্ত-করণ; ম্রক্ষণ; অন্‌জ + অন্‌ট ভাব, বি; স্ত্রী। (৩) পশ্চিমদিগ হস্তী; পর্বত বিশেষ। জ্যেষ্ঠী, আজনাই; অন্‌জ + অন কর্তৃ বি; পুং।

৪.৩. নিরঞ্জনা শব্দের অর্থ ঃ

'নিরঞ্জনা' শব্দটি বহুভাষিক শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত পালি ভাষায় এর প্রয়োগ পাওয়া যায়। পালি অর্থকথাসাহিত্যে এ শব্দের অর্থ এভাবে দৃষ্ট হয়—"নজ্জা নদতি নসন্দতীতি নদী, তস্‌সা নজ্জা, নদিয়া নিন্নগায়া'তি অথো। নেরঞ্জরায়া'তি নেলং জলমস্‌সাতি 'নেলজলায়া'তি বত্তব্বে 'ল'-কারস্‌স 'র'-কারং কত্বা নেরঞ্জরায়া'তি বুত্তং। (বোধিবগ্গো/১ পঠমবোধিসুত্তবন্ননা)। অর্থাৎ যা কল্ কল্ নাদ করে প্রবাহিত হয় এবং ছোট বা বড়ো

জলাশয়ে বা জলধারায় বা অন্যত্র মিশে তা নদী। নিম্নগামিনী হওয়াই এর স্বভাব। নদী শব্দের এ হল অর্থ।

প্রাকৃত ভাষাসমূহে প্রায়ই ই-কারের পরিবর্তন এ-কারে হতে দেখা যায়। তাই 'নিরঞ্জরা' শব্দে 'নেরঞ্জণা' রূপে উচ্চারিত হয়। আবার কোথাও কোথাও ল-কার র-কারে পরিবর্তিত হবার কারণে এ 'নেরঞ্জলা' শব্দটি 'নেলঞ্জলা' রূপেও পালি সাহিত্যে প্রযুক্ত হয়েছে। 'নের' বা 'নেল' শব্দের অর্থ স্বচ্ছ। অর্থাৎ যার জল স্বচ্ছ তাই 'নেরঞ্জরা' বা 'নেলঞ্জলা'। নিরঞ্জনা নদীর জল এতই স্বচ্ছ থাকতো যে নীল আকাশের প্রতিফলনে এ নদীর জল নীল বর্ণের মত দেখাতো। এ কারণে একে নীলাজল বা নীলবাহিনীও বলা হয়ে থাকে। পালি সাহিত্যে 'নেলঞ্জলা' শব্দের প্রয়োগ বড় জোর পাঁচ-ছয় বারই করা হয়েছে। কিন্তু 'নেরঞ্জরা' শব্দের প্রয়োগ বহুবার বহু প্রসঙ্গে করা হয়েছে। পালি বিনয়পিটকের মহাবর্গস্থ মহাস্কন্ধের বোধিকথায় প্রথম পংক্তিতে নেরঞ্জরা-র প্রথম প্রয়োগ পরিলক্ষিত।

৪.৪. নদী অর্থে নিরঞ্জনা ঃ

বুদ্ধকালীন মগধ জনপদের (বর্তমান বিহার প্রদেশের) অন্তর্গত আটটি প্রমুখ নদী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিরঞ্জনা একটি অন্যতম।

৪.৫. বৈদিক সাহিত্য নৈরঞ্জনা ঃ

'নিরঞ্জন' শব্দের প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। সেখানে এটি পরা ব্রহ্মা, অমৃত অর্থসূচক হয়।

৪.৬. পালি সাহিত্যে নিরঞ্জনার মাহাত্ম্য ঃ

পালি সাহিত্যের মূলধারা হল পিটক সাহিত্য। বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্মপিটক—মুখ এ তিনভাগে বিভক্ত হওয়ায় পিটককে ত্রিপিটক বলা হয়। পিটক বা ত্রিপিটকের প্রথম পিটক হল বিনয়পিটক। বিনয়পিটকের আবার মুখ্য তিনটি ভাগ—খন্ধক, বিভঙ্গ ও পরিবার। ঐ খন্ধক (স্কন্ধক) আবার মহাবগ্গ ও চুলবগ্গ নামে দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধক (খন্ধক) হল মহাবগ্গের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পংক্তি (পালি পত্তি) এরূপ—"**একং সময়ং ভগবা উরুবেলায়ং বিহরতি নজ্জা নেরঞ্জরায়ং তীরে**—" অর্থাৎ ভগবান (বুদ্ধ) নিরঞ্জনা (নৈরঞ্জনা) নদীর তীরবর্তী উরুবেলায় অবস্থান করতেন। এখানে বলাবাহুল্য যে মূল পিটক সাহিত্যে নিরঞ্জনা শব্দের উল্লেখ খুব কম পাওয়া যায়।

বোধিমণ্ডপে বসার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাক্রমগুলোর যদি সিংহাবলোকন করা হয় তবে জানা যাবে যে নিরঞ্জনা নদীর পূর্বপাড়ে প্রত্যন্ত এলাকায় কিছু অনুচ্চ পর্বত-শৃঙ্খলা ছিল। এখানে দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করা কালে মার এসে ভয়-ভীতি, শাম, দাম, দণ্ড প্রয়োগের পর বলেছিলেন "উরুবেলায় গ্রীষ্মকালের প্রখর তাপে নদীর জলও শুকিয়ে যায়। শরীরের ত্বক, অস্থি, রক্ত, মাংস, স্নায়ু আদি শুকিয়ে ফেলা তো তুচ্ছ ব্যাপার"।

বাংলার বৈশাখ (ইংরেজী মে/জুন) মাসে প্রচণ্ড উত্তাপ থাকলেও নিরঞ্জনা নদী একেবারে জলশূন্য হয় নি। এ নদীর ক্ষীণস্রোতে তাপস সিদ্ধার্থ স্নান করেছিলেন এবং অন্ন গ্রহণের পর

যেমন—লীলাজন। কোথাও একে নৈরঞ্জনা বলা হয়ে থাকে। খুব সম্ভবত সংস্কৃত নৈরঞ্জনা শব্দেরই তৎকালীন স্থানীয় লোকভাষায় নীলাজল, লীলাজল বা নিরঞ্জন (স্ত্রী-লিঙ্গ-নিরঞ্জনা) রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পিটক সাহিত্যে নিরঞ্জনা নদীর বিস্তারিত কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এতে যা কিছু উপাদান পাওয়া যায় তাও অতি সামান্য।

এটি ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সিমরিয়া, পরবত, কোলকেলে কালান, জোরি কালান, কোরলা, হান্টারগঞ্জ; গয়া জেলার ডোভি, বুদ্ধগয়া (উরুবেলা), স্বরাজপুরী, ঘঙঘরী টান্ট হয়ে বয়ে চলে।

সীমারিয়ারই পাশাপাশি রামনগর হতে প্রবাহিত মোহনা (মোহনে) নামে আর একটি নদী গয়া জেলার অন্তর্গত বকরৌর (পালি সাহিত্যে বর্ণিত সেনানী-গ্রাম বর্তমান সুজাতা-কুঠি) গ্রামের পূর্বপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটি নিরঞ্জনা অপেক্ষা ক্ষীণতরা।

এ দু'টি নদী খুব সম্ভবত ডুঙ্গেশ্বরী (প্রাক্-বোধি) গুহার কাছাকাছি স্থানে মিলিত হয়েছে। এর পর সম্মিলিত জলপ্রবাহ ফল্গু নাম ধারণ করে এগিয়ে গেছে। পরিণামে ফল্গু নদীর বিস্তৃতি (প্রস্থ-বিস্তৃতি) অনেক (প্রায় ৫০০গজ) বেড়ে যায়।

এর পর গয়া জেলার সীমানা পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব দিক হয়ে বিহারের নবগঠিত জাহানাবাদ জেলার সীমানায় ফল্গু নদী প্রবেশ করে। (গয়া হতে ৪২ কিলোমিটার দূরে এবং বেলা স্টেশন হতে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং পরবর্তীকালে নির্মিত) স্থানীয় বরাবর-পর্বত-গুহা ও নাগার্জুনী-পর্বতের বেশ কিছু (২৫ কিলোমিটার) দূরে এসে ফল্গু নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়।

দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর ফল্গু নদী তার এ নাম পূর্ণতা হারিয়ে ফেলে। অনেকের ধারণা ফল্গু নদীর ধার্মিক মাহাত্ম্য (পবিত্রতা) গয়া শহরের সীমানা অবধি সীমিত থাকে।

ফল্গুর পশ্চিম শাখার নাম হয় শুঙ্গর। এ নতুন নামে পরিচিত ফল্গু নদীটি বরাবর পর্বতগুহার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়া কালে ভুড়ভুড়ি নামে একটি উপনদী এসে এর সাথে মিলিত হয়। এ শুঙ্গর এখান থেকে দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়।

ফল্গু নদীর পূর্ব শাখাটি আগের নাম হারিয়ে পুনরায় মোহনা নাম ধারণ করে এগিয়ে চলে হুলাসগঞ্জের দিকে। এর পর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে এটি মানসিঙ্গি নামে পরিচিত হয়। এরপর এটি উত্তর-পূর্ব দিকে ইসলামনগর নামে একটি ছোট শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলে। এর পর তা ননয়ঙ্গ/শুঙ্গরের সাথে মিলিত হয়। মোহনা হতে বিচ্ছিন্ন হবার তের মাইল (প্রায় বিশ কিলোমিটার) দূরে। এর পর প্রায় ছয় মাইল (দশ কিলোমিটার) দূরত্ব অতিক্রম করে তা পুনপুন নদীর ধোবা নামক শাখা নদীর সাথে মিশে। আর ঐ শাখা এভাবে গঙ্গাস্থ হয়। এর আরেক শাখা নদী নালন্দা, নবাদা হয়ে লখীসরাই, জমুই ইত্যাদি অঞ্চলে নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে ক্রমশ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

ফল্গু নদী গয়া শহরের বিষ্ণুপদ (ধাম) মন্দির, পাণ্ডু-কুটি্ঠ, আখরা, দাদপুর ও খিঝড়ি-সরাই এবং শর্মা ও ঘোষি এলাকার মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে। এর উৎপত্তি-স্থল সিমরিয়া হতে কোবনা অবধি যাত্রাপথ বড়ই দুর্গম। পাহাড়িয়া সর্পিল পথে কখনও উল্টো ধারায় এঁকেবেঁকে

একে নামতে হয়। এ নামার প্রক্রিয়ায় একাধিক পার্বত্য ঝর্ণার জলধারা উপনদীরূপে এ নীলাজলার (নিরঞ্জনা) সাথে একাকার হয়। এতে এটি স্রোতস্বিনী হয়ে উঠে। বিশেষত বর্ষা-ঋতুতে এর গতি হয় দুর্বার। দূরন্ত হরিণের ন্যায় কখনও বা খোঁচা খাওয়া বিষধর সর্পের ন্যায় এ নদীর জল কখনও বা এপাড়ে কখনও বা ওপাড়ে ঘা খেয়ে আরও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে তার গন্তব্য স্থলের দিকে। কখন একে এর পাথুরে (মরা) তল চিরেও এগোতে হয়। এ যাত্রাপথের দু'পাশে এমন কি তলের মরা পাহাড় থাকায় এর প্রবাহে বড় বা ছোট নুড়ি-পাথর থাকে না। যেমন অন্য জ্যান্ত পাহাড়ী নদীর বেলায় দেখা যায়।

এরপর ঝাড়খণ্ড প্রদেশের হান্টারগঞ্জ পেরিয়ে এটি সমতলের ছোঁয়া পায়। ক্রমশঃ এটি গয়া জেলার ডোভি এলকায় বিস্তৃতি পায়। দু'পাড়ের মাটির সংস্পর্শে আসে এটি। বর্ষাকালের কর্দমাক্ত জলে এর দু'কূল প্লাবিত হয়। পরিণামে দু'পাড়ের জমি উর্বর ও সার-সমৃদ্ধ থাকে।

বর্ষা, হেমন্ত বা বসন্ত ঋতুতে সবুজ গাছ-গাছালিতে এর দু'পাড়ের জমি সবুজময় থাকে। নিম, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শাল আদি বৃক্ষে ভরা থাকে এর দু'পাড়। এছাড়া আম, জাম, তাল, কাঁঠাল, খেজুর, আমলকি, বেল, পেঁপে ধান, গম, ভুট্টা, অরহর, তিল, শর্ষ, আর কলা আদির গাছও প্রচুর হয়। কোথাও রঙ্গবেরঙ্গের শষ্যে দু'পাড়ের জমি রঙ্গবেরঙ্গী হয়ে থাকে। কোথাও এ নিরঞ্জনা নদীর ধারে ধারে স্থিত ছোট ছোট গ্রামগুলোর পাশেই অনুচ্চ পর্বতশৃঙ্খলা। সব মিলে এরা পরস্পরের শোভা বর্ধন করে। উরুবেলার আর নিরঞ্জনার অপর পাড়ের সেনা নিগমের (সেনানী গামে) সবুজ লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদিতে সুশোভিত পরিবেশ যে কোনো প্রকৃতি-প্রেমী মানুষের মনকে ব্যাকুল করে তোলে। তাঁদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে।

নিরঞ্জনার এ অপরূপা রূপ গ্রীষ্মকালে কিন্তু একেবারে বদলে যায়। গ্রীষ্মকালের সূর্যের প্রখর উত্তাপে পুরো নদীটাই প্রায় নির্জলা হয়ে যায়। সমতলে এবং প্রবাহমান জলের স্থলে শুকনো বিস্তৃত বালুকাচর মাত্র দেখা যায়। দু'পাড়ের জমিও শুকিয়ে ধূসর মরুভূমি তুল্য হয়ে পড়ে। তখন ঐ নদীর বিস্তীর্ণ বালুকাচরের মাঝে কোথাও দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে ক্ষণকালের জন্যে হলেও তাঁর কাছে মনে হবে সে যেন সাহারার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত সে এ ধূসর বালুকাচরকে নদী আখ্যা কেন দেওয়া হয় ভেবে আশ্চর্য ব্যক্ত করবে। কাজেই একে বহুরূপিনী বললে মোটেই অত্যুক্তি হয়না। এ মন্তব্য করার আর একটি কারণ আছে। সেটি হল— এ নদীর উৎপত্তি-স্থল হতে আরম্ভ করে গঙ্গায় বিলয় হওয়া অবধি যত নাম পরিবর্তন করেছে এত নাম বোধ হয় বর্তমান বিহার প্রদেশের আর কোন নদী করেনি।

নিরঞ্জনা ফল্গু নামেও পরিচিত। এ নাম দুটি বৌদ্ধ সাহিত্যে ভিন্ন প্রেক্ষিতে সমধিক উল্লেখিত। এ নদী এবং এর শাখানদীগুলো গাঙ্গেয় অববাহিকার বিস্তৃত অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ফল্গুর বিশিষ্টতা শাস্তা সুগত বুদ্ধের সাধন-ক্ষেত্র বুদ্ধগয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্তঃসলিলা নদী হিসেবে অধিক বর্ণিত। এর অন্তঃস্থলে তিন হাজার বছরের অধিক ইতিহাস লুকানো রয়েছে। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে তা উন্মোচনের ক্ষুদ্র প্রয়াস করা হল।

বৈদিক যুগে যখন নানা আচার-সর্বস্বতার বেড়াজালে ও জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে মানবতা গুমড়ে মরছিল, তখন তার মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনিই প্রথম বেদ-ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং জাতিভেদের অসারতা প্রতিপন্ন করে সমাজে যারা মনুষ্যত্যের জীবন যাপন করছে, সেই তথাকথিত চণ্ডাল-শুদ্রদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন। বস্তুত তখনও কাজ করা তেমন সহজসাধ্য ছিল না।

অন্তঃসলিলা ফল্গু অনেক ইতিহাস বুকে নিয়ে আজও প্রবাহমান। একদিকে সম্রাট অশোকের কীর্তিগাথা, অপরদিকে তুর্কি আক্রমণ নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্ত-পুরী প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাবিহার একে একে ধ্বংস করে। লুটেরাদের পৈশাচিক উল্লাস, যার নীরব সাক্ষী এ ফল্গু নদী। আর এ মর্মন্তুদ অন্তর্বেদনার আখ্যায়িকা এ ফল্গু (নিরঞ্জনা) নদী।

বৌদ্ধ গ্রন্থে ফল্গু নাম-করণের মধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। ফল্গু একটি নদীর নাম, যা বর্তমান বুদ্ধগয়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এ ফল্গুর কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। কখনও বা এতে এক বুক জল, কখনও হাঁটু জল, কখনও শুকিয়ে একেবারে অন্তঃসলিলা হয়। বিভিন্ন ঋতুতে ফল্গুর বিভিন্ন রূপ। তবে ফল্গু একেবারে শুকিয়ে গেছে—এ কথা বলা সমীচিন নয়। কথায় বলে—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো।

আধুনিক ঝাড়খণ্ড ও বিহার প্রদেশের অন্তবর্তী প্রবহমান একটি নদী। ঝাড়খণ্ড প্রদেশের চাতরা ও হাজারীবাগ—এ দুই জেলার এবং বর্তমান বিহার প্রদেশের গয়া, জাহানাবাদ, পাটনা জেলা হয়ে এর একটি শাখা পুনপুন নদীতে মিশেছে। পরে পুনপুন নদী গঙ্গা নদী ও সোন নদীর সঙ্গমস্থলে মেশে।

নিরঞ্জনা নদী (নীলাজন, *নীলাজন*, লীলাজল) বিষ্ণুপদ হয়ে এগিয়ে যায়। এখানে নিরঞ্জনা নদী আর একটি পার্বত্য নদী মোহনা নদীর সাথে মিলিত হয়। *পরিণামে* তা ৩০০গজ বিস্তৃতি লাভ করে গয়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে নদীটি আরও প্রায় ৯০০গজ ছড়িয়ে পড়ে। নিরঞ্জনা নদী ও মোহনা নদীর মিলনক্ষেত্র হতে নিরঞ্জনা নদী ফল্গু নদী নামে সামান্য জনের কাছে পরিচিত হয়। বিষ্ণুপাদের পর ফল্গু নদীর উত্তরপূর্ব দিকে ধারা বদলে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে জেলা জাহানাবাদের বরাবর পর্বত শৃঙ্খলার ধার ঘেঁসে এগিয়ে চলে। এখানে এসে ফল্গু নদী নাম বদলে মোহনা নদী নাম ধারণ করে। কিছু দূরে গিয়ে এ মোহনা নদী দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়। এ মোহনা নদীর একটি শাখার সাথে মিলিত হয়ে পাটনা শহরের নিকটবর্তী এলাকায় (গঙ্গা নদী ও সোণ নদীর সঙ্গমস্থলে) মিশে যায়।

এ নদীটি গয়া শহরের কিছু দূরে আর একটি পার্বত্য নদী মোহনা'র সাথে মিলিত হয়ে এক নতুন নামে প্রবাহিত হয়। নতুন নাম ফল্গু। এটি একটি সংস্কৃত নিষ্ঠ শব্দ। এর পালি রূপ 'ফল্গু বা ফেগ্গু (ফেগ্গু-সুত্ত দ্রষ্টব্য)। এর প্রয়োগ সামান্য তিনটি অর্থে দেখা যায়—(১) অসার, তুচ্ছ, মনোহর; (২) কাগ, বসন্তকাল, বৃথাবাক্য; (৩) গঙ্গাস্থ নদী বিশেষ।

জীবনের অসারতাকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নদীর সাথে তুলনা করা হয়। নদী তার শান্ত অবস্থায় খুবই মনোরম মনে হয় কিন্তু ঐ নদী যখন অশান্ত হয়ে পড়ে, তখন তা বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে। আবার গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে জল শুকিয়ে যায়, তখন ঐ নদী তার মনোরম

রূপ হারিয়ে ফেলে। ঐ অসারত্বকে ফল্গু (ফল্গু, ফেগ্গু) বলা হয়। গাছের মূল কাণ্ড কাটা হলে তাতে ভিন্ন রঙ্গের এক বর্তুলাকার অংশ থাকে। একে বলা হয় ফেগ্গু। এ ফেগ্গু-র আকার ও রঙ্গ দেখে বৃক্ষ-ব্যবসায়ীরা গাছের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করে থাকেন।

বুদ্ধকালীন মগধ জনপদের যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাহাত্ম্যের নদী ছিল ওসবের মধ্যে নিরঞ্জনা (নীলাজন, লীলাজল), ফল্গু, মোহনা নদীর নাম অন্যতম।

৫. নিরঞ্জনা নদীর ধর্মীয় মাহাত্ম্য

৫.১. বৈদিক পরম্পরায় নিরঞ্জনার ধর্মীয় মাহাত্ম্য ঃ

বায়ু পুরাণের অন্তর্ভুক্ত গয়া-মাহাত্ম্য অনুসারে ফল্গু বিষ্ণুরই প্রতীক। কেন না ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু (সলিল)-ধারা রূপে অবতরিত হন। দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞ করাকালে ব্রহ্মা যে আহুতি দিয়েছিলেন তা হতেই ফল্গুনদীর উৎপত্তি হয়।

হিন্দু পরম্পরা মতে মানুষ তার মৃত্যুর পর তার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান না দেবার কাল অবধি প্রেতাত্মারূপে বিচরণ করে। তাই মৃত্যুর পর প্রেতাত্মারূপে জন্মানো প্রাণীকে (প্রেতযোনি হতে) মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের ধর্মীয় বিধি-বিধান রয়েছে। আবার পুনর্জন্ম ও পুর্নমৃত্যুময় সংসারচক্রের বন্ধন হতে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যেও পিণ্ডদান করা হয়। তাই গয়াতে সারাবছরই পিণ্ডদানের ধর্মীয় কাজ চলতে থাকে।

সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করা যেমন পিতার পারিবারিক নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্যরূপে মান্যতা প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পরলোকগত মাতা-পিতা ও প্রেতযোনিতে জাত পূর্বপুরুষদের (প্রেতাত্মাদের) প্রেতযোনি হতে উদ্ধারার্থে গয়া এসে পিণ্ডদান করাকেও কোন এক গৃহীর পক্ষেও অত্যাবশ্যক পারিবারিক ও ধর্মীয় কর্তব্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.২. বৈদিক ঐতিহ্যে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান ঃ

মাসে দু'টি পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপদ হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেরটি দিনের (তিথি) কাল শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার পরদিন হতে অমাবস্যা দিন (তিথি) অবধি পনেরটি দিনের কালকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। প্রতিমাসেই এমন দুই পক্ষ হয়। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষকে হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রেতপক্ষও বলা হয়।

এ পক্ষের যে কোনো এক দিনে গয়া তীর্থে এসে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দেওয়া গোলাকার (পিণ্ডাকারে) ভক্ষ্যবস্তু দান করাকে 'পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান' বলা হয়।

ধর্মভীরু প্রতিটি হিন্দুকে পিতৃপক্ষকালে গয়ায় এসে পিতৃকূলের পূর্বপুরুষদের পরিতৃপ্তি দানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত চারটি কর্ম করতে হয়। (১) মস্তক মুণ্ডণ করা। (২) বৈতরণী পুষ্করিণীতে মাথা ডুবিয়ে স্নান করা। (৩) ফল্গু-নদীর তীরে বসে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও স্মৃতি-তর্পণ আদি করা। (৪) ফল্গু-নদীর তীরবর্তী বিষ্ণুপাদ (গয়াধাম) মন্দিরে গিয়ে পিণ্ডজীবী ব্রাহ্মণদের (পাণ্ডাদের) মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের পারলৌকিক শ্রাদ্ধকর্ম (মঙ্গল কামনা) করা।

এ থেকে স্বতসিদ্ধ হয় যে, বৈদিক পরম্পরা মতে গয়া পুণ্যার্থী প্রেতপুরুষদের সমাগম স্থল। পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানকারী ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে পিণ্ডদানকালে তাঁদের কালগত পূর্বপুরুষগণ অতি আগ্রহে পিণ্ডদানের সময় গয়ায় এসে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকেন।

কোন নদীর অন্তঃসলিলা হবার অর্থ বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে নদী স্রোতস্বিনী থাকবে না, অথচ এর বালুকাচরের যেখানে সেখানে দুই/তিন হাত বালি খুঁড়লেই স্বচ্ছ জল পাওয়া যায়। বর্ষাঋতু বাদে অন্য সব ঋতুতে বিশেষত গ্রীষ্মঋতুতে যখন নদী শুকিয়ে একেবারে জলশূন্য হয়ে পড়ে তখন শহরের ধোপারা অজস্র সাময়িক জলাশয় বানিয়ে অসংখ্য নোংড়া কাপড়-চোপড় ধোয়।

৫.৩. পৌরাণিক সাহিত্যে পিণ্ডদান ঃ

রামায়ণ মতে রাণী কৈকেয়ীকে দেওয়া রাজা দশরথের বর অনুসারে রাম, সীতা ও লক্ষণ চৌদ্দ বছরের অজ্ঞাতবাসে ছিলেন— রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করা কালেই রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগ-শোকে মারা যান। রাজা দশরথ প্রেতলোকে প্রেতাত্মা হয়ে পুত্রগণের মাধ্যমে দেয় পিণ্ডদানের প্রতীক্ষায় থাকেন।

এ অজ্ঞাতবাস কালে তাঁরা তিনজন এ বিষ্ণুপাদ (গয়াধাম) মন্দিরে এসেছিলেন। পিতৃ তৃপ্তির কথা তাঁদের মনে ছিল। পিণ্ডদানের কাজটি মধ্যাহ্নের পূর্বেই সেরে ফেলতে হয়। সে কথা মনে রেখে রাম পিতৃপক্ষেরই এক দিন তাঁর ভাই লক্ষণকে পিণ্ডদানের আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লক্ষণ পাশের গ্রামে গেলেন অথচ সময়ে ফিরে আসলেন না। এর পর রাম নিজেই গেলেন প্রেতাত্মার ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনিও নিশ্চিত সময়ে ফিরে এলেন না। পিণ্ডদানের মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সীতা দেবী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন। অশান্ত হন। কারণ তাঁর কাছে কোন প্রকারের ফলমূলাদি ছিল না। কি দিয়ে পিণ্ডদান দেবেন?

ঠিক তখনই আকাশবাণীরূপে দশরথের প্রেতাত্মার নির্দেশ ভেসে আসে সীতার কাছে— 'বালির পিণ্ড বানিয়ে পিণ্ডদান দাও'। সীতাদেবী তা শুনে বালি দিয়ে পিণ্ড তৈরি করেন আর ঐ পিণ্ডদান দেন। তৎক্ষণাৎ আকাশে ঐ পিণ্ডদান গ্রহণে ইচ্ছুক হাত দেখা যায়। কিন্তু ঐ হাতের কোন ধর ছিল না। তা দেখে সীতাদেবী জিজ্ঞেস করেন— কে তুমি? কেন এসেছো এখানে? এর উত্তরে আকাশবাণীরূপে উত্তর ভেসে আসে, "হে সীতে! আমি তোমার শ্বশুর দশরথের প্রেতাত্মা"। আরও বলেন—"হে সীতে তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। তোমার দেওয়া পিণ্ডদান গ্রহণ করে আমি বড়ই তৃপ্ত। রাম-লক্ষণকে এ কথা বললে হয়ত তাঁরা বিশ্বাস করবেন না। তখন এ চারটি—ফল্গুনদী, পাশের চরা এ গরু, আগুন আর কেতকীর ঝাড় তোমার পুণ্য কর্মের সাক্ষী হবে।"

এ ঘটনা ঘটার কিছু পর ফলমূলাদি আহরণ করে রাম ও লক্ষণ উভয়ে ফিরে আসেন। সীতাদেবী উৎসাহের সাথে তাঁর দেওয়া পিণ্ডদানের এবং 'শ্বশুর মহোদয়ের প্রেতাত্মার তৃপ্তি প্রাপ্তির কথা বলে শোনান। রাম-লক্ষণ সীতাদেবীর বালির তৈরি পিণ্ডদানের কথা বিশ্বাস করলেন না।

রাম ও লক্ষণ তাঁদের আনা ফলমূল দিয়ে যখন পিণ্ডদান দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক তখনই আকাশবাণীরূপে কিছু কথা ভেসে আসে। তা এরূপ—"দেখ, রাম, সীতাদেবীর দেওয়া পিণ্ডদান গ্রহণ করে আমি পরিতৃপ্ত। আমি তোমাদেরই পিতা দশরথের প্রেতাত্মা বলছি।"। এতে রাম ও লক্ষণ লজ্জিত হন।

এরপর সীতাদেবী ফল্গুনদীকে অভিশাপ দেন যে, অঞ্জনমুক্ত জলের জন্য এ নদীর এত সুনাম-সুখ্যাতি তা শুকিয়ে অন্তঃসলিলা হয়ে পড়ুক। ঐ অভিশাপে নৈরঞ্জনা বা ফল্গু অন্তঃসলিলা হয়ে পড়ে। অন্য তিনটির কি দশা হল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। পাশেই এক বটবৃক্ষ ছিল। ঐ বটবৃক্ষটি কিন্তু সীতাদেবীর ধর্মসঙ্কটে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। তাই সীতাদেবী সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন—"হে বটবৃক্ষ, তুমি অক্ষয় হয়ে থাকো"। তখন হতে ঐ বটবৃক্ষ অক্ষয়বৃক্ষ নামে সুখ্যাতি পায়।

কথিত আছে এ গয়া নগরী নাকি গয়া নামক এক রাজর্ষি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একবার তিনি এক যজ্ঞ করেছিলেন। ঐ যজ্ঞে প্রচুর অশ্বাদি পশু দান করেছিলেন। এতে গয়াবাসী দেবগণ প্রীত হয়ে বরদান করে বলেছিলেন—"পরে এ যজ্ঞক্ষেত্র তোমার (গয়া) নামে প্রসিদ্ধ হবে"। মূলত ঐ যজ্ঞক্ষেত্র এবং ঐ যজ্ঞক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত অঞ্চল আজ গয়া শহর ও গয়া জেলা রূপে সুপরিচিত।

শাস্ত্রসম্মতভাবে বলা হয় তীর্থরাজ গয়ায় এসে কেহ যদি পাপ করে থাকে তবে এ পাপ হতে কোনকালেও নিষ্কৃতি নেই। তাহলে বিষ্ণু তার এ জঘন্য পাপ হতে কোনদিন কি নিষ্কৃতি পাবেন? কখনই না কখনই না।

এ গয়া নামক রাজর্ষির কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজ সুলভ নয়। আশা করি এমন কিছু নিদর্শন শীঘ্রই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচর হোক।

এখন প্রমাণ রূপে যা কিছু বিদ্যমান তা হল ২২০ বছর পূর্বে রাণী অহল্যাদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বিষ্ণুপদ মন্দির।

গয়া স্টেশন হতে বুদ্ধগয়া যাবার পথের পশ্চিমপার্শ্বে কিছু মরা পাহাড় আছে। ওসবের মধ্যে একটি বেশ বড় ও উঁচু। তাই ওটিকে গয়াশীর্ষ বলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা একে ব্রহ্ম-যোনি বলে থাকেন। সাধারণত ব্রহ্মযোনি অর্থে ব্রহ্মের উৎপত্তিস্থলকেই বোঝায়। কিন্তু এখানে সে'ই অর্থে বোঝানো হয়নি। তবে এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিশাল এবং যোনি শব্দের অর্থ গুহা (সুরঙ্গ)। অতএব ব্রহ্মযোনি শব্দের অর্থ বিশাল আকারের গুহা বা সুরঙ্গ। পালি সাহিত্যের বিনয়পিটকে একে 'গয়াসীসং' বলা হয়েছে।

৫.৩. বৌদ্ধ পরম্পরায় নিরঞ্জনার ধর্মীয় মাহাত্ম্য ঃ

মায়া, মোহ ও মমতা আদি মারের সব রূপকে মর্দন করে সত্যকে আর্যসত্য-রূপে জেনে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়েছিলেন। এর সাথে তিনি পারিবারিক বন্ধন ও ভববন্ধন ছিন্ন করে পুনর্জন্ম হওয়ার সব সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করেছিলেন। কাজেই প্রেতলোকে তাঁর পুনর্জন্ম নেওয়া তো দূরের কথা, সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকেও জন্মের সম্ভাবনা নেই তাঁর। তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ঘোষণা হওয়ায় মৃত্যুরাজ যম ও মার তথাগত বুদ্ধ কিভাবে মৃত্যু বরণ

করবেন বা মৃত্যুর পর কোথায় যাবেন (জন্ম নেবেন)—তা জানার সব গোপন প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু যমের বা মারের ঐ সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ তাঁর জন্মক্ষণেই ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন—এ তাঁর অন্তিম জন্ম। এর পর তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর উচ্চারিত প্রথম উদান-গাথাতেও প্রকারান্তরে ঐ একই কথা ধ্বনিত হয়। অর্থাৎ তাঁর পুর্নজন্মরূপী গৃহ নির্মাণের স্তম্ভ ও খড়কুটো তিনি নিজেই মার-মর্দনের মাধ্যমে ভেঙ্গে খান খান করেছেন।

এ ব্যাপারে তিনি এতই আশ্বস্ত ছিলেন যে তিনি মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের বা সঙ্ঘের কারও উপর তাঁর পারলৌকিক হিত-কামনায় পিণ্ডদানের দায়িত্ব দিয়ে যান নি। কারও কাছ থেকে তেমন কিছু প্রাপ্তির আশা-প্রত্যাশার সামান্যতম অংশ-টুকুও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় একবার, দু'বার নয় অনেকবার প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে তাঁর ন্যায় অরহতগণের মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম হয় না। কাজেই এমন সব অরহতগণের উদ্দেশ্যে তথাকথিত পিণ্ডদানের কোন আবশ্যকতা হয় না।

৫.৪. বৌদ্ধ ঐতিহ্যে পিণ্ডদান ঃ

বুদ্ধ পূর্ব ও তাঁর সমকালীন ভারতীয় সমাজে চিরাচরিত বহুকিছুর অবতারণা প্রায়োগিক/ব্যবহারিক মূল্য বুদ্ধ বলেছেন। ওসবের মধ্যে পিণ্ডদান একটি অন্যতম।

শাস্তা সুগত বুদ্ধের শিষ্য দু'শ্রেণীর— গৃহীশিষ্য (উপাসক-উপাসিকা) এবং গৃহত্যাগী শিষ্য-শিষ্যা (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রামণের-শ্রামণেরী)। গৃহী শিষ্য-শিষ্যাগণের জীবিকা অর্জনের দায়-দায়িত্ব তাঁদের নিজেদের। কিন্তু গৃহত্যাগী শিষ্য-শিষ্যাগণের জীবিকা অর্জনের দায়-দায়িত্ব সামান্য জনের মত নয়। তাঁদের জীবন-ধারণের জন্যে বুদ্ধ-প্রবর্তিত সম্যক্ জীবিকাকে অবলম্বন করতে হয়। তা না হলে তাঁদের জীবন-উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবন-ধারণের জন্যে যে চারটি অত্যাবশ্যক সামগ্রী (প্রত্যয়) প্রয়োজন তা হল—অন্ন-ব্যঞ্জন, বস্ত্র, বিহার এবং ঔষধ-পথ্য। এসব সংগ্রহের জন্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বা শ্রামণের-শ্রামণেরীদেরকে গৃহী সমাজের উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া ওসব গ্রহণের বা সেবনের ব্যাপারে বুদ্ধ-প্রবর্তিত অনেক বিধি-বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্ন-ব্যঞ্জন ঃ সঙ্ঘের সদস্য-সদস্যাকে অন্ন-ব্যঞ্জন সংগ্রহের ব্যাপারে গৃহীদের নিমন্ত্রণ না পেলে তাঁদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকার বিধান রয়েছে। ঐ দাঁড়িয়ে থাকাকালে গৃহস্থজনেরা তাঁদের ভিক্ষাপাত্রে পিণ্ডাকারে অন্ন-ব্যঞ্জন দেন (পাত করেন)। তাই ঐ অন্নব্যঞ্জন দানকে 'পিণ্ডদান' বলা হয়। কোন গৃহীর উপর কোন এক ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর জীবন-নির্বাহের পরিপূর্ণ দায়িত্ব-ভার যেন অনাবশ্যক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে না বর্তায়, এ কারণে যে কোন উপাসক-উপাসিকার অসন্তুষ্টি বা বিরক্তির (অশ্রদ্ধার) মাত্রা বেড়ে না যায়, এর জন্যে পিণ্ডপাত গ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এ পিণ্ডদানের ভিত্তিতেই বুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ আজ প্রায় তিন হাজার বছর যাবৎ সুষ্ঠুভাবে চলে আসছে।

৫.৫. বৌদ্ধধর্মে পুণ্যদান ও প্রেতকথা ঃ

বুদ্ধ যখন রাজা বিম্বিসারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা কল্পে বুদ্ধ হবার পর প্রথমবার

রাজগৃহে গমন করেন, তখন বুদ্ধ-প্রথম ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার এবং বিহার দান করতে পেরে মগধরাজ বিম্বিসার অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। যেদিন বিহার নির্মিত হয় সেদিন রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যান। কিছুক্ষণ পর তাঁর চোখের পাতা এক হয়েছে কি, হয় নি এমন অর্দ্ধ তন্দ্রাবস্থায় এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন তাঁর চারদিকে ক্ষীণকায় কিম্ভূতাকিমাকার বিশিষ্ট অনেকে এসে বিকট চিৎকার করছে। এমন ভাবে ব্যক্ত করছে যেন তারা বহুদিন যাবৎ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ যাবৎ ঐ দুঃস্বপ্ন চলায় মগধরাজ বিম্বিসারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এমন দুশ্চিন্তায় ঐ রাতে তাঁর আর ঘুম হয়নি। ভোর হতেই মগধরাজ বিম্বিসার এদিক-ওদিক না গিয়ে সোজাসুজি বেণুবন-বিহারে চলে যান। শাস্তা প্রত্যুষকালে রাজাকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বিহার-প্রাঙ্গনে আসতে দেখে চংক্রমণ হতে বিরাম নিয়ে বিহারে প্রবেশ করে নিজ আসনে বসেন। মগধরাজ বিম্বিসারও শাস্তাকে অভিবাদন করে একপাশে বসেন।

তখন শাস্তা সুগত বুদ্ধ মগধরাজকে সম্বোধন করে বলেন—মহারাজ, কেন এমন ভোর-সকালে এভাবে বিহারে এলেন? উত্তরে রাজা বলেন—"ভগবান, গত রাতে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। এরপর মগধরাজ ঐ রাতে যা যা ঘটেছিল সব শাস্তাকে বলে শোনান। শেষে জিজ্ঞেস করেন—ভগবান, কেন, এমন দুঃস্বপ্ন দেখলাম? আমার বা আমার পরিবারের অথবা আমার প্রজাবৃন্দের কোন ভয়ানক ক্ষতি হবে কি?" তখন শাস্তা সুগত বুদ্ধ মগধরাজকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

"মহারাজ, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। যাদের আপনি দেখেছেন তারা সবাই আপনার পূর্বজন্মের অতি নিকট জ্ঞাতী। বহুজন্ম পূর্বে ফুস্স বুদ্ধের সময় বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দেয় বস্তু আত্মসাৎ করার দুস্পরিণামে তারা প্রেতলোকে জন্মেছিল। এর পর প্রত্যেক বুদ্ধের আবির্ভাব কালে তারা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে জানতে চাইতো কবে তারা এ অপায়-কুল হতে মুক্তি পাবে। এর অন্তর্বর্তী বিপস্সী বুদ্ধ, সিখি বুদ্ধ, বেস্সভূ বুদ্ধ, ককুসন্ধ বুদ্ধ, কোণাগমন বুদ্ধ ও কস্সপ বুদ্ধ প্রত্যেকেই বলতেন ভাবী গৌতম বুদ্ধের সময় মগধে বিম্বিসার নামে তোমাদের অতীত জ্ঞাতী ভবিষ্যতে মগধরাজ হয়ে জন্মাবেন। তিনি বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে আহারাদি দান দিয়ে সঞ্চিত পুণ্যরাশি তোমাদের পারলৌকিক হিত-কামনায় প্রদান করলে তবেই তোমরা যার-পর-নেই যাতনা হতে মুক্তি পাবে। তখন হতে তারা গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবে ঐ প্রেত-পুরুষরা এবার তারা এ যাতনা হতে চিরতরে মুক্ত হবে ভেবে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। মহারাজ, মনে হয় আপনি বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহারাদি দান দেবার পর শাস্তা সুগত বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষু-সঙ্ঘ কোথায় থাকবেন ঐ চিন্তায় অত্যধিক মগ্ন থাকায় প্রেতপুরুষদের উদ্দেশ্যে পুণ্য প্রদান করতে ভুলে যান। এ ঘটনায় ক্ষোভে-দুঃখে ও হতাশায় বড়ই ক্ষুব্ধ হন। এ বুদ্ধের সময় যদি তারা প্রেতযোনি হতে মুক্ত হতে না পারেন তবে কবে হবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই মহারাজ আপনার কাছ থেকে পুণ্যপ্রাপ্তির আশায় আপনার জ্ঞাতীপ্রেতরা এভাবে পুণ্য প্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে"।

মগধরাজ বিম্বিসার ঐ দিন বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে পূর্বাহ্নে রাজপ্রাসাদে আহার গ্রহণের

আমন্ত্রণ জানান। মগধরাজ বিম্বিসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য-পাণীয়াদি প্রদান করে বুদ্ধ-প্রমুখ-ভিক্ষু-সঙ্ঘকে পরিতৃপ্ত করান এবং নিজেরাও পরিতৃপ্ত হন। এর পর ভগবান বুদ্ধ কালানুকুল এক সংক্ষিপ্ত ধর্মোপদেশ (ভুক্তানুমোদন কথা) শোনান। পরে মগধরাজ বিম্বিসার ঐ দিনের কুশলকর্ম-জাত পুণ্যরাশি প্রেত-পুরুষদের পারলৌকিক হিত-কামনায় প্রদান করে নিশ্চিন্ত হন। ঐ দিন রাতে মগধরাজ আবার স্বপ্নে তাদের দেখেন, তবে তাদের সবাই দিব্য দেহধারী হলেও তারা ছিলেন উলঙ্গ।

পরদিন মগধরাজ বিম্বিসার পুনরায় বেণুবন-বিহারে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে ঐ রাতের স্বপ্নকথা শোনান এবং তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ভগবান বুদ্ধের পরামর্শে ঐ দিন পূর্বাহ্নে বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহারাদি দানের পর তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র (চীবর) প্রদান করেন। শাস্তার সংক্ষিপ্ত দেশনার পর জ্ঞানী প্রেত-পুরুষগণের উদ্দেশ্যে পুণ্যরাশি প্রদান করেন।

ঐ দিন রাতেও মগধরাজ বিম্বিসার আবার স্বপ্ন দেখেন। তবে এবারের স্বপ্ন বিভীষিকাময় বা বিভৎস না হয়ে বড়ই আনন্দ-দায়ক ছিল। কারণ স্বপ্নে যাদের দেখা গিয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই হৃষ্ট-পুষ্ট মহার্ঘ্য বস্ত্রে দিব্য আভাময় ছিল। এর পর মগধরাজ বিম্বিসার আমরণকাল অবধি তেমন স্বপ্ন আর দেখেন নি।

খুব সম্ভবত তখন হতে বৌদ্ধধর্মে মৃত পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনদের (প্রেতপুরুষ) পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় বর্তমানে জীবিত পুত্র-কন্যা বা নিকট জনেরা নিজ বাসস্থানে বিহারে, তীর্থস্থলে বিশেষত বুদ্ধগয়ায় ভিক্ষু-সঙ্ঘের ব্যবহার্য চতুর্প্রত্যয় বিশেষত অন্ন-ব্যঞ্জন (পিণ্ডপাত) দান করে থাকে। অনাথদের বা দীন-দুঃখী, পশু-পাখি বা জলচরদের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য খাবার দিয়ে থাকেন।

মনুষ্যলোকে জীবিকাপোর্জনের নানাবিধ পেশা (উপায়) রয়েছে যেমন—কৃষিকর্ম, পশুপালন, চাকুরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্যাদি। প্রেতলোকে জাত প্রেত-পুরুষদের জীবন ধারণের তেমন কোন পেশা (উপায়) নেই।

পালি সাহিত্যের প্রেতবস্তু ও একাধিক অর্থকথা সাহিত্যে চার প্রকার প্রেতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ চার প্রকার প্রেত হল যথা—(১) খুপ্পিপাসিকা প্রেত, (২) বন্তসিকা প্রেত, (৩) নিজ্ঝামতণি্হক প্রেত ও (৪) পরদত্তুপজীবী পেত। এ চার প্রকার প্রেতেরই উল্লেখ একত্রে মিলিন্দ-প্রশ্ন গ্রন্থে পাওয়া যায় (চতুন্নং পেতানং তয়ো পেতা নগ্গটিলভন্তি, বন্তন্সিকা, খুপ্পিপাসিতো, নিজ্ঝমতণিহকা, লভন্তি পেতা পরদত্তুপজীবিনো)।

(ক) **ক্ষুৎপিপাসা (খুপ্পিপাসিকা) প্রেত ঃ** এক শ্রেণীর প্রেতরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকেন। সম্মুখে জলাশয় থাকলেও তারা তাদের শারীরিক অবয়বের কারণে জল বা পানীয় কিছু ইচ্ছানুসারে পান করতে পারে না, যেমন কাক-পাখী। তারা তাদের ঠোটের কারণে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ জলপান করে জলের চেষ্টা পূর্ণতা মেটাতে পারে না। উট্টের মুখে জীরে যাবার ন্যায় প্রেতরা সামান্য জলবিন্দু পান করে দীর্ঘকালীন জল তেষ্টা কি করে মেটাবে? পরের প্রদত্ত পুণ্যরাশি তারা পেতে পারে না।

(খ) **বমিত পদার্থ খাদক (বন্তাসিকা) প্রেত ঃ** এমন শ্রেণীর প্রেতরা অপর প্রাণীর বা মানুষের *ত্যাজ্য* বা বমিত পদার্থ খেয়ে বা পান করে তাদের ক্ষুধা বা পিপাসা মেটায়। এরাও পরের প্রদত্ত পুণ্যরাশি উপভোগ করতে পারে না।

(গ) **তৃষ্ণায় শোষিত (নিজ্ঝামতণি্হকা) প্রেত ঃ** তৃষ্ণার জ্বালা বড় জ্বালা। এর দাহন-শক্তি আগুনের চেয়েও প্রচণ্ড। অধিক কাল আগুনের পাশে বসে থাকা বলবান মানুষও যেমন দুর্বল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি অপূর্ণ ও ক্রমবর্ধিত তৃষ্ণার কারণে ধাবিত ও শোষিত হয়ে প্রাণী বিশেষত প্রেতরাও ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়। এমন প্রেতদের শ্রেণীকে নিজ্ঝামতণি্হকপেত বলা হয়।

(ঘ) **পর-প্রদত্ত-উপজীবী (পরদত্তুজীবী) প্রেত ঃ** প্রেতদের মধ্যে (উপরোক্ত তিন শ্রেণী বর্জিত) এরাই একমাত্র এমন শ্রেণীর প্রেত যারা প্রেতযোনিতে নিজেদের যোগ্য জীবিকা উপার্জন করতে না পারলেও মনুষ্যলোকে জীবিত মানবরূপী আত্মীয়-স্বজনদের দেওয়া পুণ্যরূপী উপভোগ্য (খাদ্য-ভোজ্য-পানীয়াদির) বিষয়ের উপভোগ করে নিজেদের জীবন ধারণ করে। মানবরূপী আত্মীয়-স্বজনেরা যে খাদ্য-ভোজ্য-*পাণীয়াদি* গ্রহণ করে নিজেদের জীবন ধারণ করেন, ঐ খাদ্য-ভোজ্য-পানীয়ের উপভোগ করার ক্ষমতা এ প্রেতদের নেই। তাই মানবরূপী আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের নিজেদের উপভোগ্য উত্তম শ্রেণীর খাদ্য-ভোজ্য-পানীয়ের উপভোগ করার ক্ষমতা এ প্রেতদের নেই। তাই মানবরূপী আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের নিজেদের উপভোগ্য উত্তম শ্রেণীর খাদ্য-ভোজ্য-পানীয়াদি অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু-সঙ্ঘকে খাইয়ে-দাইয়ে পরিতৃপ্তি দান করে যে পুণ্যরাশি প্রাপ্ত হন, তা ঐ শ্রেণীতে জাত আত্মীয় প্রেতদের উপকারের কথা স্মরণ করে পুণ্যদান করলে ঐ পুণ্যের প্রভাবে ঐ প্রেতদের অনুকূল উপভোগ্য খাদ্য—ভোজ-পানীয়ে বা পদার্থে পরিণত হয়। তা উপভোগ করে পরদত্তুপজীবী প্রেতরা ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি করে। এভাবে ঐ যোনি হতে তারা সাময়িক মুক্তি পেয়ে থাকেন।

তাই বৈদিক মতে পিণ্ডদান বলতে এমন পরদত্তুপজীবী প্রেতদের পারলৌকিক উর্দ্ধগতি কামনা করে তাদের নামে 'পিণ্ডাকারে যে খাদ্য ভোজ্য ও অতিরিক্ত জল দেওয়া হয় তা'ই বোঝায়। কারণ পিণ্ডাকারে প্রদত্ত অন্ন পাণ্ডাদের কোন কাজেই আসে না। তা শেষে নালা-নর্দমা বা জলাশয়ে পরিত্যক্ত হয়।

বুদ্ধের বা বৌদ্ধধর্ম মতে ভিক্ষু সঙ্ঘকে দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জনই সত্যিকারেই 'পিণ্ড'। আর ঐ পিণ্ডদান বা চতুর্প্রত্যয় দান-জনিত পুণ্য পরদত্তুপজীবী জ্ঞাতী-প্রেতদের পারলৌকিক উর্দ্ধগতির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।

৬. গয়া ও এর প্রসঙ্গ কথা

৬.১. গয়া শহরের প্রাচীনত্ব ঃ

অন্য এক মতে এ শহরের নাম গয়া নামক অসুরের নামানুসারে হয়েছে। ঐ গয়া অসুর ছিলেন অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত। গয়ার এ বিষ্ণুভক্তিতে যমের একবার ভয় উৎপন্ন হয়—এ বুঝি তার অধিকার লোপ পাবে। যম বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলেন—তার অধিকার যেন লোপ না পায়।

যমের অনুরোধ রক্ষার্থে নিরপরাধী বিষ্ণুভক্ত গয়াকে যুদ্ধ করার প্ররোচনায় প্ররোচিত করে তাকে ধরাশায়ী ও হত্যা করে তার উপর এক বিশাল শিলাখণ্ড চাপিয়ে দেন। তবে বিষ্ণু তাঁর ঐ বিষ্ণুভক্ত গয়াকে বর দেন—এ গয়াধামে সকল দেবতা বাস করে থাকেন। এ গয়াধামে বিষ্ণুর পদচক্রে যে বা যারা পিণ্ডদান করবে তাঁর বা তাঁদের পরলোকগত প্রেতাত্মারা সদগতি (প্রেতযোনি হতে মুক্তি) লাভ করে।

যদি এটি কাল্পনিক না হয়ে সত্যি হয়ে থাকে, তবে এখানে দু'টি প্রশ্ন জাগে। প্রথম প্রশ্ন—গয়াসুরের অত্যধিক বিষ্ণুভক্তির এ কি সুপরিণাম? বৈদিক সাহিত্যে এমন ঘটনার অভাব নেই যেখানে ভক্তকে তার ভক্তির পরিণাম নির্মমতার সাথে ভুগতে হয়েছে। তাহলে মানুষ এমন বিষ্ণুতে আস্থা রাখবে কেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল যম কি তাহলে বিষ্ণুর চেয়েও অধিক শক্তিশালী ছিলেন যে যমের কথামতো তার রক্ষার্থে গয়াসুরকে তাঁর বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিশাল শিলাখণ্ডের অব্যক্ত চাপ আজও বয়ে যেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতেও কতকাল ঐ ভার সইতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিশাল *কালশিলাখণ্ডের* চাপ সয়ে অপরকে মুক্তিদানের অনন্তকালীন দায়িত্বভার বহন করার কোন নৈতিকতা আছে কি? কোন সার্থকতা আছে কি? যমকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নিজে কেন নেন নি? এক প্রাণীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার্থে নিরপরাধী গয়াসুরকে কেন চুকাতে হল? এ অপরাধের জঘন্যতম অপরাধী বিষ্ণু নয় কি? গয়াসুরের বিষ্ণুভক্তিতে গয়াসুরকে মুক্তি না দিয়ে তাঁকে অনন্তকালীন চাপ দেওয়ার দণ্ড দিয়েছেন তাতে কি বিষ্ণু পক্ষপাত করার দোষে দোষী হয়ে পড়ে না? এ কেমন গয়াতীর্থের ঐতিহ্য? এমন বিষ্ণুভক্ত গয়াসুরের নামে গয়া শহরের নামকরণ করা হয়েছে—তা হয়ত চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তার বিষয় হবে। এমন তীর্থে গিয়ে তীর্থযাত্রীরা কি শুধু তাদের পিতৃপুরুষদের প্রেতাত্মাদের কান্নার স্বর শুনতে পারেন অন্যদের কান্নার সুর শুনতে পান না। বিষ্ণুই বা কেন দু'কানে দু'আঙ্গুল চাপিয়ে নীরবে কালক্ষেপন করছেন?

এখানে এ কথাগুলো বলার মুখ্য উদ্দেশ্য পৌরাণিক ঐতিহ্যের যে পরম্পরা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে তাকে আবেগ ও অন্ধবিশ্বাসের নিরিখে না দেখে এর যৌক্তিক বাস্তবতা অনুধাবন করা।

৬.২. বিষ্ণুগয়া ঃ

গয়া যজ্ঞক্ষেত্র ও পুণ্যক্ষেত্র রূপে বর্ণিত হয়ে আসছিল। এর *প্রশংসকদের* মধ্যে অধিকাংশতই ছিলেন পিণ্ডজীবি পাণ্ডাগণ। অনুগামীরা হন ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ। আপামর জনসাধারণের সাধারণত চিন্তাশক্তি কম থাকে। তাঁরা পাণ্ডাগণের *নির্দেশে* গড্ডালিকা প্রবাহের মতো কেবল এগিয়ে চলেন। পাণ্ডাগণ তাঁদের উদর-পূর্তির স্বার্থে জনসাধারণের ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগান। গয়া-ধর্মের পূজা-অর্চনায় ও যাজযজ্ঞের সূচীতে প্রেতাত্মাদের প্রেতযোনি হতে মুক্তিদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রেতকুলে কিভাবে কেহ জন্ম নেবে না তার কোন সঠিক নির্দেশনা ঐ পাণ্ডাগণ কোনদিন দিতে পারেন না। ঐ পাণ্ডাগণই নিজেদের অত্যধিক লোভ ও মোহ জনিত কর্মের কারণে মৃত্যুর পর কতবার কুকুর, বেড়াল বা প্রেতাত্মা হয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। বৌদ্ধ বিদ্বেষী পাণ্ডাগণ এককালে প্ররোচনার সুরে

বলতেন—বুদ্ধগয়ায় গেলে বিষ্ণুগয়ায় অর্জিত পুণ্য ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই পুণ্যার্থীরা পুণ্য খোয়াবার ভয়ে বুদ্ধগয়ার দিকে তাকিয়েও দেখতেন না।

নিরঞ্জনা নদী উরুবেলার তট ও বিষ্ণুপাদ মন্দির প্রাঙ্গণ ঘেঁসে প্রবাহিত হয়েছে। বস্তুত আজ এটি গয়াধামকে ছুঁয়েছে। গয়াধাম দু'প্রকারের। এক হল বিষ্ণুগয়া। ঐ প্রাচীন গয়া থেকে বিষ্ণুপাদ বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হল গয়া এবং এটি প্রাচীন উরুবেলা ও বোধিদ্রুমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা শহর (বর্তমান বোধগয়া)।

প্রথমটি বিষ্ণু (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) ছলে-বলে-কৌশলে তাঁর পরম ভক্ত গয়াকে বধ করেছিলেন বলে গয়া আর বিষ্ণু তাঁর পদচিহ্ন রেখেছেন। বলে এ ধামকে (বিষ্ণুপাদ) গয়াধাম বলা হয়। কিন্তু বর্তমান বুদ্ধগয়া সরকারী মতে 'বোধগয়া' নামটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। এর কারণ নিরঞ্জনা নদীর পূর্বতটবর্তী উরুবেলা গয়াসুরের বধের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাই এ অঞ্চলের 'বোধগয়া' নামটির সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। গয়া নামক রাজর্ষি এখানে কোন প্রকারের যজ্ঞ করেন নি। কাজেই কোন মতে এ উরুবেলা গয়া নামের সাথে যুক্ত হতে পারে না।

৬.৩ বুদ্ধ-গয়া ঃ

অন্যদিকে মানব মনের যে ঘোর মোহান্ধতা, পরসম্পত্তি লোলুপতার কারণে মানবকে বার বার প্রেতকুলের ন্যায় নিম্নযোনিতে জন্মগ্রহণ করে যার-পর-নেই যাতনা ভোগে বাধ্য হতে হয়েছে, ওসবে যাতে আর জন্ম নিতে না হয় তার জন্যে দান, শীল, ভাবনা বা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাময় ত্রি-চরণ বিশিষ্ট মধ্যমমার্গের আবিষ্কারের মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ যে মোহান্ধতাকে কুঠারাঘাত হেনেছেন। সাথে অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ধর্মান্ধতার সরব বিরোধিতা করেছেন। এ মার-মর্দন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি এ উরুবেলার বোধিদ্রুম তলে ঘটিয়েছিলেন *বোধিসত্ত্ব* তাপস সিদ্ধার্থ। শুধু তাই নয় প্রাণীকে যাতে নিম্নগতিতে জন্ম না নিয়ে কেবল ক্রমোন্নত যোনিতে বা সুগতি লাভ করতে পারে তারও ব্যবস্থা করেন। শুধু তা নয় প্রাণীকে দুঃখদায়ক স্থিতি কোনক্রমেই যাতে ভোগ না করতে হয় অর্থাৎ প্রাণী নৈর্বাণিক স্থিতি পেতে পারেন তারই সুনিশ্চিত পথ প্রদর্শন করেছেন।

বিষ্ণুধামে ব্রহ্মা স্বয়ং নেমেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। তবে মানবকুলের এবং দেব-ব্রহ্মা-মানব এমন কি সমগ্র প্রাণীকুলের রক্ষার্থে ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্ধান হয়ে সহম্পতি নামে এক ব্রহ্মা মনুষ্যলোকের এ নিরঞ্জনা তটে অজপাল নিগ্রোধমূলে সম্যক্ সম্বুদ্ধের সম্মুখে আবির্ভূত হন। নতজানু হয়ে বসেন। করজোড়ে প্রার্থনা করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধকে ধর্মোপদেশ দিয়ে জ্ঞানীজনের জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করার কাতর অনুরোধ করেন।

উরুবেলায় এসে পুণ্যার্থীগণ মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের স্মরণ করার সাথে সহম্পতি ব্রহ্মার এখানে আসার কথা স্মরণ করলে পুণ্য দ্বিগুণিত হয়। দেবতুষ্টি বিধানার্থে বুদ্ধ দেবগণের দিব্যগুণের কথা স্মরণ করতে অবশ্যই বলেছেন, তবে তাঁদের তুষ্টি বিধানার্থে রক্তক্ষরণ-জনিত যাগযজ্ঞের পরামর্শ কোনদিন দেননি। এর স্থলে অপার মৈত্রী-করুণা, মুদিতা-উপেক্ষাময় ব্রহ্মবিহার ভাবনা করার পরামর্শ দেন। এতে দেবগণের তুষ্টি সাধনের সাথে ভাবনাকারীগণ আত্মতৃপ্তি এবং অপরিমিত পুণ্যের অংশীদারও হন। বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ তীর্থরাজ বারাণসী

ও গয়াধাম (বিষ্ণুপাদ) ত্যাগ করে উরুবেলায় এসে বোধি-দ্রুম-মূলে মারবিজয়ের মাধ্যমে সম্বোধি (পরম জ্ঞান) ও নির্বাণ (পরম সুখ) প্রাপ্ত করে তিনি পূর্বাপর অনন্ত জন্মের অনন্ত বুদ্ধের পরম্পরাকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সম্বোধি-প্রাপ্তির বেলায় বারাণসী বা গয়াধামের যে কোন ভূমিকা নেই, তা তিনি সিদ্ধ করান। মার-মর্দন-ক্রমে সহস্র বাহুসম্পন্ন মার ও তার অসংখ্য বলবাহিনীকে বুদ্ধ তাঁর পারমিতাগুণে পরাভূত করেছিলেন বটে তবে তার মাধ্যমে কারো কোন প্রকারের রক্তক্ষয় হয় নি। পূর্ণত অহিংসাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সর্বজয়ী হয়েছিলেন উরুবেলাকে সাধনভূমি এবং বোধিদ্রুমকে তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থান চয়নের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে চিন্তাশীল মানব-সমাজের সম্মুখে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন।

এ উরুবেলায় বিশেষ বোধিদ্রুমতলে পাশের ছয়টি স্থলে বুদ্ধের সাথে কোন গয়া-অসুরের কস্মিনকালেও যুদ্ধ হয়নি, তাই উরুবেলাকে গয়ারূপে চিহ্নিত করা সঙ্গতপূর্ণ বলে মনে হয় না। এখানে কোন বিষ্ণু একবারও এসেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। এখানে যা রয়েছে তা হলো বুদ্ধের পদচিহ্ন। তাই বুদ্ধপাদ নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। তবে তা ততটা জনপ্রিয় হয় না।

উরুবেলাকে যদি তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ঘটনাকে ভিত্তি করে শুধু বুদ্ধ রাখা হয়, তা হলেও অর্থটা স্পষ্ট হয়না। আর একটি অর্থে 'বুদ্ধগয়া' নাম রাখা যেতে পারে, যার অর্থ হল এখানে 'বুদ্ধ এসেছিলেন' এবং 'বুদ্ধ হবার পর তিনি চলে যান'। তবে এখানে বুদ্ধগয়া অর্থ গয়াসুর থাকে না। গয়ার অর্থ হিন্দি সাহিত্য মতে 'যান' হয়ে যায়। যদি কেবল নিরঞ্জনা বা সম্বোধি রাখা হয় তবে তাও ততটা অর্থবহ হয় না। বর্তমানে এর সরকারী নাম রয়েছে (পোষ্ট অফিস— বোধগয়া, এর পিন কোড ৮২৪২৩১)। এটি ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত বা পালি ভাষার কোনটিই নয়। এটি একটি হিন্দি শব্দ। হিন্দিতে এর অর্থ হয়— যে 'বোধশক্তি' হয়েছে তারও 'লোপ পাওয়া'। বুদ্ধগয়ার প্রতি যে অসহিষ্ণুতার ভাব বৌদ্ধ বিদ্বেষীদের মনে কতখানি ঘর পেতে বসেছিল তা তার স্পষ্ট উদাহরণ। বৌদ্ধদের কাছে বোধগয়া নামটি আত্মঘাত তুল্য। যেকোনো আত্ম-সম্মানী ব্যক্তির কাছে বুদ্ধগয়ার 'বোধগয়া' নামটি কিছুতেই গ্রহণীয় নয়।

৭. ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নানা মতবাদ

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব এবং এর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে নানা পর্যায় রয়েছে, যেমন—প্রকৃতিবাদ, নানাদেববাদ, একদেববাদ, ঈশ্বরবাদ ভিত্তিক কর্মবাদ, শুদ্ধকর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ ইত্যাদি।

বাদ-মতবাদ বিবিধ হলেও প্রায় সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণীর পুনর্জন্মে অটুট বিশ্বাস রয়েছে। প্রাণীর এ পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত হোক্ বা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত, প্রাণীকে তার কৃতকর্মের পরিণাম দু-আকারে বা সু-আকারে) ইহ বা পরজন্মে ভোগ করতে হয়। সামান্যজনের কাছে কর্মবিকারে বন্ধন হতে নিষ্কৃতি নেই। যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম-কাণ্ড মতে ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ করিয়ে মানুষ দেব-ব্রহ্মাদির তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে প্রেতাত্মাদের প্রেতযোনি হতে মুক্তি

দেওয়ানো সম্ভব। ঐ মুক্তি প্রেতাত্মাদের কাছে সাময়িক হয়ে থাকে বা স্থায়ী হয় তা পণ্ডিত জনের কাছে বিবাদাসম্পদ হতে পারে।

কৈকেয়ীকে দেওয়া রাজা দশরথের প্রতিশ্রুতি (বরদান) মোটেই ন্যায় সঙ্গত ছিল না। তা ছিল পূর্ণত পক্ষপাত-দুষ্ট। অন্য রাণীদের তুলনায় কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের স্নেহাধিক্যের কারণে এমন বিকট পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে দশরথ-পুত্র রাম, তাঁর ধর্মপত্নী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে চৌদ্দ বছরের অজ্ঞাতবাসে যেতে হয়েছিল। তাঁদের বিয়োগে রাজা দশরথের হৃদয়-বিদারক মৃত্যু অত্যধিক পুত্রস্নেহ-সূচক প্রতীত হয়।

রাজা দশরথের এ আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং প্রেত-গতি প্রাপ্তির মূলে রাজার নিজ কর্মই দায়ী ছিল, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা যমেদের কেহ উত্তরদায়ী ছিল না। রাজা দশরথের প্রেতাত্মার পরামর্শে নিরঞ্জনা নদীর বালির পিণ্ডে সীতাদেবীর দেওয়া পিণ্ডদানের প্রভাবে ঐ প্রেতাত্মার মুক্তি প্রাপ্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করেও নানা প্রশ্ন উঠে আসে। পিণ্ডদানের মাধ্যমে দশরথের প্রেতাত্মা মুক্তির প্রাপ্তিতে সীতাদেবীর প্রদত্ত পিণ্ডদানই যদি মূল কারণ হয়ে থাকে, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের গুরুত্ব অধিক দেওয়া হয়, তবে কর্মবাদ গৌণ হয়ে পড়ে। আর যদি কর্মবাদকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে গৌণ হয়ে পড়ে নায় কি? বুদ্ধকালীন চিন্তাশীল মানুষকে এমন সব নানা দোটানায় থাকতে হত। টান-টান দোটানায় থাকাটা চিন্তাশীল মানব-মাত্রকেই দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার প্রয়াসী করে তোলে। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে সামাজিক, ধার্মিক ও দার্শনিক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। যাদের অবদানে এ বিপ্লব সরব জন-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল তাঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ অন্যতম।

তিনি মানবের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধার্মিক ও দার্শনিক সব জটা জটিলতাকে দূরে সরিয়ে সরল ও স্বচ্ছ করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন। মহামানব বুদ্ধ ছিলেন একজন কর্মবাদী। কর্মবাদী হওয়ায় তিনি পূনর্জন্মবাদীও ছিলেন। তবে তিনি তাঁর কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদে বেদ বা ব্রাহ্মণ্য প্রথার ন্যায় অত্যাবশ্যক ঈশ্বর বা ব্রহ্মবাদের কোন গুরুত্বই দেন নি। তাই তাঁর প্রবর্তিত কর্মবাদকে শুদ্ধ-কর্মবাদও বলা হয়। নিরঞ্জনার অপর পাড়ে সশ্রদ্ধচিত্তে সুজাতার প্রদত্ত ক্ষীরান্ন খেয়ে কোন প্রেতাত্মার মুক্তি না মেললেও তাপস সিদ্ধার্থ নামে একজন বোধিসত্ত্ব যে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়ে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে কারো সন্দেহ নেই। সুজাতার ক্ষীরান্ন দানের প্রভাবে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুম মূলে বসে সোপাদিশেষ-নির্বাণ পেয়েছিলেন আর এর পঁয়তাল্লিশ বছর পর কুশীনগরে যমক-শালরাজ-বৃক্ষ-মূলে অনুপাদিশেষ নির্বাণ (মহাপরিনির্বাণ) প্রাপ্তির পথ শুধু প্রশস্তই করেন নি, তা তিনি সুনিশ্চিতও করেছিলেন। তাঁর এ সোপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশাদি কোন পরাশক্তির বরদহস্ত-প্রার্থী তিনি কখনই ছিলেন না।

৮. বৌদ্ধ কর্মবাদ

প্রাণীর বিশেষত মানুষের জীবনে কৃতকর্মের সংখ্যা ও প্রকার অসংখ্য। তবে বোধগম্য করে তোলার উদ্দেশ্যে ওসব কর্মকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যেমন—(১) অকুশল-কর্ম, (২) কুশল-কর্ম ও (৩) অব্যাকৃত-কর্মে (অহেতুক-কর্ম)।

(ক) অকুশল-কর্ম ঃ

যে কর্ম সৃজনের মূলে কর্মকর্তার মন লোভ, দ্বেষ, মোহাদির এক বা একাধিক অকুশল-হেতুতে সম্প্রযুক্ত থাকে এবং যে কাজের (কর্ম) সম্পাদনে কর্মকর্তা নিজে এবং অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা শাস্তা সুগত বুদ্ধ মতে অকুশল-কর্ম। যে কর্মের বিপাকে কর্মকর্তাকে অনুতাপ-পশ্চাপের সাথে ইহলোক ও পরলোকে দুর্গতি ভোগ করতে হয়, তাকে অকুশল-কর্ম বলা হয়। এমন কর্মকে কৃষ্ণ-কর্মও বলা হয়ে তাকে। কারণ এমন কর্মের প্রভাবে মানবমনের শুক্লাংশ মুছে যায়।

(খ) কুশল-কর্ম ঃ

যে কর্ম-সৃজনের মূলে কর্মকর্তার মন অলোভ, অদ্বেষ, অমোহাদির এক বা একাধিক কুশল হেতুতে সম্প্রযুক্ত থাকে এবং যে কাজের (কর্ম) সম্পাদনে কর্মকর্তা নিজে এবং অপরে আনন্দ লাভ করে, শাস্তা সুগত বুদ্ধের মতে তা কুশল-কর্ম। যে কর্মের বিপাকে কর্মকর্তা ইহ বা পর উভয় লোকেই ক্রমোন্নত সুখ ও সুগতি ভোগ করে, তা কুশল-কর্ম। এমন কর্মকে শুক্ল-কর্মও বলা হয়ে থাক, কারণ এমন কর্মের প্রভাবে মনের কৃষ্ণাংশ ধুয়ে-মুছে যায় আর মন পূর্ণত শুকল ও প্রভাস্বর হয়ে উঠে।

(গ) অব্যাকৃত-কর্ম (অহেতুক-কর্ম) ঃ

যে কর্মের সৃজনকালে কর্মকর্তার মনে অকুশল-হেতু (লোভ, দ্বেষ, মোহ) যুক্ত থাকে না, আবার কুশল-হেতু (আভ, অদ্বেষ, অমোহ) যুক্ত থাকলেও কিন্তু কুশল-কর্মের ন্যায় কুশল-বিপাকা প্রদান করে না, তা অহেতুক-কর্ম। কুশল-কর্ম বা অকুশল-কর্ম রূপে এ কর্মের বর্ণনা করা যায় না, তাই একে অব্যাকৃত-কর্ম-রূপে বর্ণনা করা হয়। একে নয়-কৃষ্ণ বা নয়-অকৃষ্ণ-কর্মও (নেব-কণ্হং-ন-অকণ্হং কম্মং) বলা হয়ে থাকে। এ শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম কেবল অর্হৎ (আর্য) পুরুষ-গণই করে থাকেন।

এ কর্মবাদের সৃষ্টি ঐ নিরঞ্জনা নদীর তীরবর্তী উরুবেলার বোধি-বৃক্ষ-তলে বোধিমণ্ডপে হয়েছিল। এ কর্মবাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছিল তথাগত গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির অনুলোম-প্রতিলোম নিয়ে। আর তার বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা রয়েছে অভিধর্ম পিটকের প্রস্থান (পট্ঠান) প্রকরণে। এর আবিষ্কার হয়েছিল এ উরুবেলারই নিরঞ্জনা নদীর তীরে।

৯. নিরঞ্জনার ঐহিত্য (নিষ্কর্ষ)

ভৌতিক সব কিছুই অনিত্য। যা অনিত্য তার কোথাও না কোথাও অন্তেরও সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থ রচনার কাজও নানা ভৌতিক উপাদানে তৈরি হওয়ায় তারও কোথাও না কোথাও শেষ আছে। 'নিরঞ্জনার ঐতিহ্য' নামক গ্রন্থের অন্ত এসেছে—একে সারকথাও বলা হয়। বুদ্ধ বলেছেন অসার কথা (ফল্গু বা ফগ্গু) কোন পরিস্থিতিতেই বলতে নেই। বলতে যদি হয় তবে বিস্তৃতাকারে পারলে ভাল, আর যদি সম্ভব না হয় সার-সংক্ষিপ্ত কথা বলা অতি উত্তম, অতি মঙ্গল।

'নিরঞ্জনার ঐতিহ্য' শীর্ষক গ্রন্থে 'নিরঞ্জনা'র শব্দার্থ ধারাকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নানা আকর গ্রন্থের উপকরণ এখানে পরিবেশিত হয়েছে। বর্ণ্য-বিষয়ের আলোচনা-সমালোচনার দিকটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এর সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত থাকে।

বর্ষাকালে পার্বত্যাঞ্চলের খরস্রোতা নদী হওয়ায় 'নিরঞ্জনা নদী'-র জলপ্রবাহ কর্দমাক্ত থাকে। অর্থাৎ তা স-অঞ্জন থাকে। কিন্তু অবর্ষাকালে হয় কারোর অভিশপ্ত। কখনও কখনও শাপে বর হয়ে অন্তঃসলিলা হয়ে নদীটি ঐ নামের সার্থকতা বজায় রেখেছে। স-অঞ্জন জলকে বদলে নিরঞ্জন করার কাজ অনন্তকাল ধরে হয়ে আসছে। অন্ততপক্ষে সীতাদেবীর কাল হতে তো তা অবশ্যই চলছে।

অন্যদিকে দেব-ব্রহ্ম-মানবকুলে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ প্রথম মানুষ ও প্রথম প্রাণী যিনি জন্ম-জন্মান্তরে নিরন্তর পারমিতা অনুশীলন পূর্বক নিজ আবিষ্কৃত সাধনা পথে কায়-বাচা-মনো জগতের পরিশোধন করে বিশুদ্ধিতা অর্জন এবং স্মৃতিপ্রস্থান (অনুলোম-প্রতিলোম) নয়ের প্রত্যবেক্ষণ-কালে উৎপন্ন প্রজ্ঞার উৎকর্ষ সাধন এবং সর্বজ্ঞতা (সম্বোধি) প্রাপ্তির মাধ্যমে মানবের মানস জগতকে সম্ভাব্য সব মালিন্য, পাপ, কলঙ্ক ও অঞ্জন ধর্ম (অকুশল চৈতসিক) থেকে নিজেকে পূর্ণত 'নিরঞ্জন' করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিজে নিরঞ্জন হয়েছেন আর তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের বুদ্ধচর্য্যা-কালে অপর কত শত সহস্রকে তিনি নিরঞ্জন হবার প্রেরণা দিয়েছেন। কত শত সহস্র জনের নিরঞ্জন হবার পথ প্রশস্ত করেছেন—তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম সম্বোধি প্রাপ্তির কাল হতে আরম্ভ করে সদ্য আয়োজিত ৩০০০ সম্বোধি বর্ষের পূর্তির কাল অবধি মহামানব বুদ্ধ তাঁর আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত নিরঞ্জন ধর্ম এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিরঞ্জন সঙ্ঘের নিরন্তর সম্যক্ প্রয়াসে কত কোটি মানুষকে নিরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছেন তার সঠিক অঙ্ক কেহ কষতে পারবে না। ভাবী নিরঞ্জনদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এ তো শুধু হলো কেবল গৌতম বুদ্ধের প্রয়াসের সুফলের কথা।

এ প্রয়াস যে শুধু গৌতম বুদ্ধই প্রথম করেছিলেন তা নয়। তাঁর পূর্বে কোন্ বুদ্ধের সময় তখন তাঁর বোধিচর্য্যার অনুকূল অনেক জীব এমন কি নির্জীব তত্ত্বও উৎপন্ন হয়। যেমন বোধিবৃক্ষরূপে অশ্বত্থ-বৃক্ষ। আমার মনে হয় উরুবেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলধারা 'নিরঞ্জনা'র নামটি এমন সহায়ক ধর্মের একটি। খুব সম্ভবত এমন সহায়ক ধর্মের অদৃশ্য চুম্বকীয় আকর্ষণের কারণে মহাভিনিষ্ক্রমণের পর বোধিসত্ত্ব (গণ) উরুবেলার (বুদ্ধভূমি) দিকে ছুটে আসেন।

'নিরঞ্জনা'র আর একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বিন্দু হল অন্য অবৌদ্ধ তীর্থস্থানে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, আদি দেবদেবীর তুষ্টি সাধনার্থে তাদের নামে যাগ-যজ্ঞাদি করা হয়। দেবতারা সন্তুষ্ট না হলে তাদের কৃত যাগ-যজ্ঞাদি সবই বৃথা হয়। কিন্তু নিরঞ্জনার তীরে কৃত পুণ্যকর্মের মূল উদ্দেশ্য হল—নিজেকে পূর্ণত অঞ্জন মুক্ত করা (সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা; সচিত্ত-পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানং সাসনং)। এখানে অন্য কারো তুষ্টিদানের চেয়ে আত্মতুষ্টি লাভকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিজের মানস-জগতে বিদ্যমান যেসব মানবীয় গুণ সুপ্তাবস্থায় রয়েছে ওসবের (শোভন চৈতসিকের) উৎকর্ষ সাধনই নিরঞ্জনার তটে বসে কৃত পুণ্যকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বলা যেতে পারে নিজেকে দীপতুল্য করে পরকে আলো দান করা। নিজেকে মঙ্গলময় করে অপর সবারে এবং বিশ্বকে মঙ্গলময় করাই নিরঞ্জনার প্রাচীন এবং সনাতন ঐতিহ্য।

এ নিরঞ্জনা নদীর আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হল এটি ভারতের প্রাচীন দুই সনাতন ধর্মকে নিজের স্বচ্ছ ও নির্ভর (নিরঞ্জন) জল (সাংস্কৃতিক পরম্পরা)-এর মাধ্যমে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে।

পরিশিষ্ট

(ক) মহাবোধি মন্দির ঃ

বোধিসত্ত্ব রাজকুমার সিদ্ধার্থের তাপস সিদ্ধার্থ হওয়া থেকে মারবিজয়ী বুদ্ধ হওয়া এবং *কুশীনারার* যমক-শাল-রাজাবৃক্ষ-মূলে তাঁর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তি অবধি কাল যেমন অনায়াসে কাটে নি, অনুরূপভাবে এ বোধিবৃক্ষের জীবনও অনায়াসে কাটে নি। এর জীবন বৃত্তান্তের পুনর্বীক্ষণে সদ্ধর্মপ্রেমী-মায়েরই মন করুণায় দ্রবিত হয়। বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজ-রাজাদের নির্মম অত্যাচার কতবার কতভাবে একে সহ্য করতে হয়েছে তার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তা সত্ত্বেও এ উরুবেলা আজ বুদ্ধগয়া-রূপে বিশ্ব বৌদ্ধগণের নিকট তীর্থরাজ-সমূহের শ্রেষ্ঠ তীর্থরাজ। তাই এদের কাছে এটি একটি অতুলনীয় অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। একারণে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এ উরুবেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে। এমনও দেশ রয়েছে যেখান থেকে জীবনে একবার আসতে পুণ্যার্থীকে অন্ততপক্ষে লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়।

পরবর্তীকালে বা কৃত্রিম উপায়ে মহাবোধি বৃক্ষের সংরক্ষণ হেতু এর চারিদিকে নির্মিত বালুকাময় পাথরে জমানো নানা প্রকার কারুকার্যে খচিত প্রাচীন শিল্প ও ঐতিহাসিক উভয় দিক থেকে মহত্বপূর্ণ। এ প্রাচীরগুলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন মানব-নির্মিত প্রাচীর বলে অনুমান করা হয়। ১৮৪ থেকে ৭২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে শুঙ্গ-রাজবংশের শাসনকালে এ প্রাচীরগুলো স্থাপিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানে মূল প্রাচীরের কয়েকটি স্তম্ভ তার মূল স্থানে রয়েছে। শেষ সব কয়টি বুদ্ধগয়া, কোলকাতা, লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

বোধিবৃক্ষ সংলগ্ন পূর্বদিক সংলগ্ন সুউচ্চ চৌকোণা মন্দিরটি মহাবোধি বিহার (মন্দির) নামে খ্যাত। এ মন্দিরের মধ্যে রয়েছে ভূমিস্পর্শ মূদ্রায় এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরটি ১৮০ ফুট উচু এবং মন্দিরগাত্রে রয়েছে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি। এ মন্দিরটি বৌদ্ধ শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। এসব শিল্প ও স্থাপত্য খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দির বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। এ মহাবোধি মন্দিরের মত বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির উত্তর ভারতে আর দেখা যায় না।

বৌদ্ধ (ধর্ম) বিদ্বেষী রাজা-প্রজাদের প্ররোচনায় ও ষড়যন্ত্রের দুষ্পরিণামে উরুবেলা ও মগধ জনপদ বৌদ্ধ বিহীন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ বহুল উরুবেলা ও মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধগণ ধর্ম ও সংস্কৃতি সাথে নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রাণ রক্ষার্থে পালিয়ে যায়। আর যারা ধর্মের স্থলে মাটিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে তারা মূল ধর্ম ও সংস্কৃতির নামরূপ পরিবর্তন করে ভিটে হারা হন নি। প্রাণ রক্ষা করেছেন। এভাবে এমন সময়ও এসেছিল ভারতের যেখানে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সেখানে বুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করার কেহ ছিল না। এভাবে প্রায় এক হাজার বছর (৮০০ খৃঃ হতে ১৮০০ খৃঃ) বৌদ্ধধর্মের এক অন্ধকার যুগ ছিল। বরঞ্চ একে ভারতের অন্ধকারময় যুগ বললে অত্যুক্তি হয় না।

এ অন্ধকার যুগে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র তুল্য নালন্দা মহাবিহার, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। বৌদ্ধ তীর্থস্থলগুলো ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। যেগুলো ভাঙ্গা সম্ভব হয় নি ওগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে হলেও নাম বিকৃত করে অস্তিত্বহীন করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস করা হয়। অধিকাংশ আরাম, বিহার, পরিবেশগুলো ভিক্ষুশূন্য হওয়ায় বৌদ্ধবিদ্বেষীগণ আত্মাধীন করে ফেলে, বুদ্ধ মন্দিরকে হিন্দুরা হিন্দু মন্দিরে ও মুসলিমরা মসজিদে পরিবর্তিত করে।

অসংখ্য ছোট আকারের বুদ্ধমূর্তিকে আশে পাশের খালে-বিলে-পুকুরে, জলাশয়ে ও নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর যেসব বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি ওসবের অঙ্গ হানি করিয়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দির পূর্বার্ধে কিছু বিদেশী গবেষকগণের ও তীর্থযাত্রীদের সুদৃষ্টি ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মর প্রতি পড়ে। তাঁদের অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের তাগিদে এ ঐতিহাসিক মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়।

ধর্মভীরু হওয়ায় পুরো হিন্দুসমাজকে তীর্থস্থলের পাণ্ডাগণের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হত। গয়ায় প্রেত ও স্থাপত্যের শ্রাদ্ধকর্মাদি শেষ করার পর কেহ যদি নিরঞ্জনা নদীর উরুবেলার (বর্তমান বুদ্ধগয়ার) দিকে যেতে চাইতো তবে পাণ্ডাগণ আদেশের সুরে যেতে নিষেধ করতো। ভয় দেখিয়ে বলতেন—ওদিকে গেলে গয়াধামের সব পুণ্য শেষ হয়ে যাবে। বুদ্ধকে 'ভূত' বলে উচ্চারণ করে পাণ্ডাগণ বলতেন—ওদিকে 'ভূতগয়া' আছে। অন্যদিকে মহন্ত নামে এক শ্রেণীর পূজারীরা মহাবোধি মন্দিরের নামে বিদেশী বিশেষত বর্মীদের দেওয়া ধন-সম্পত্তি ও ভূ-সম্পত্তি নিজেদের করায়ত্ব করে ফেলেন। একে তো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল, তদুপরি বুদ্ধ-মন্দিরের আশেপাশের ত্রিসীমানায় কোন ভিক্ষুকে পূজা-অর্চনার জন্যে ঘেঁসতে দিতেন না। ব্রাহ্মণ পূজারীদের নিয়ে বুদ্ধ পূজা-অর্চনার কাজ সারিয়ে ফেলা হতো। এ সময়ই মহাবোধি মন্দিরের মূল বেদীতে প্রতিষ্ঠিত সুরম্য বুদ্ধমূর্তিকে সরাতে না পেরে তাঁর সম্মুখে মোটা দেওয়াল তৈরি করে দেওয়া হয়। মেঝেতে শিবলিঙ্গ বসিয়ে বুদ্ধগয়ার এ বিশাল বুদ্ধ মন্দিরটি শিব মন্দিরে পরিণত করার এক চক্রান্ত চলে। আর অনেকের ত্যাগ-তিতিক্ষাময় সংগ্রামের পর বিংশতি শতাব্দিতে, সরানো হয় এবং দেওয়ালে ঢাকা বুদ্ধ-মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। আজ তা সর্ব সাধারণের নয়নাকর্ষক হওয়ায় ভয়-ভীতি বিদূরীকরণের মাধ্যমে প্রীতি-প্রসাদ প্রদান করে।

(খ) ধর্মারণ্য ঃ

কিছু বিদ্বানের মতে উরুবেলা কাশ্যপের আশ্রমটি সুজাতা-কুটির দক্ষিণে মোহনা নদীর পশ্চিমে এবং নিরঞ্জনা নদীর পূর্বে কোথাও অবস্থিত ছিল। এ আশ্রমকেই তাঁরা ধর্মারণ্য নামে অভিহিত করতে চান।

রাজগৃহ হতে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থের উরুবেলা আসার যে যাত্রা বিবরণী পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় ঐ অনুসারে নিরঞ্জনা নদী অতিক্রম না করে সরাসরি উরুবেলা স্থিত বোধি-বৃক্ষ-মূলে তাঁর আসার কোন বর্ণনা মিলে না। পালি সাহিত্যে যে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য রয়েছে তাতে নিরঞ্জনা নদীর পূর্বপাড়ের অনুচ্চ পর্বত-শৃঙ্খলা তার পাশের সেনানী গ্রামের (সেনা-নিগম)

অবস্থানের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সেনানী গ্রামের নিকটে বা দূরে উরুবেলা কাশ্যপের যে আশ্রম ছিল তার কোন সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মেলে না।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের পূর্বে শাস্তার দ্বিতীয়বার নিরঞ্জনা নদী অতিক্রম করার কোন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা করে শাস্তা সুগত বুদ্ধ যখন উরুবেলায় দ্বিতীয়বার পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। তাই শাস্তাকে উরুবেলা-কাশ্যপের আশ্রমে গিয়ে রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইতে হয়েছিল। উরুবেলা-কাশ্যপ শাস্তাকে এক নাগ অধ্যুষিত ও তাঁদের পরিত্যক্ত এক অগ্নি-শালায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আশ্রমের ঐ অগ্নি (যজ্ঞ)-শালায় যাবার পথে তাঁর নিরঞ্জনা নদী বা মোহনা নদী অতিক্রম করার কোন উল্লেখ বিনয়-পিটকের কোথাও নেই। তদুপরি উরুবেলা-কাশ্যপ ও তাঁর পাঁচশ, নদী-কাশ্যপ ও তাঁর তিনশ এবং গয়া-কাশ্যপ ও তাঁর দু'শ জটাধারী শিষ্যগণ তিন পর্য্যায়ে ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিজ নিজ জটা-বল্কল এবং আশ্রমের খড়-খুটো আদি যাবতীয় সামগ্রী নিরঞ্জনা নদীতে ভাসিয়ে দেবার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে ভগবান বুদ্ধের ঐ নদী অতিক্রম করার ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় না। সহস্রাধিক ভিক্ষু (প্রাক্তন জটাধারী) শিষ্যদেরকেও গয়াশীর্ষে ভগবান বুদ্ধ দেশিত আদিত্য-পর্য্যায় নামক সূত্র শুনতে যাবার পথে কোথাও নিরঞ্জনা বা অন্য কোন নদী অতিক্রম করতে হয়নি।

এতেই মনে হয় এ তিন ভাইয়ের তিনটি আশ্রমই নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ছিল। ধর্মারণ্য নামক তথাকথিত অরণ্যে হয়ত অন্য কোন আশ্রম ছিল।

উপরোক্ত গয়াশীর্ষ (পর্বত) বর্তমান গয়া শহর হতে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ পর্বতে একটি গুহা আছে। এখানে বসে ভগবান বুদ্ধ তাঁর সহস্রাধিক ভিক্ষুকে আদিত্য-পর্য্যায়-সূত্রের দেশনা দিয়েছিলেন। ঐ সূত্র শ্রবণ করে একসাথে এক হাজার জন পর্যন্ত ভিক্ষু অরহত্ব-ফল প্রাপ্ত হন। এ কারণে এটিও একটি দর্শনীয় ও নন্দনীয় তীর্থস্থল। হিন্দু মতে এ গুহার নাম ব্রহ্মযোনি।

নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম তীরে এ আশ্রমগুলো ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ শাস্তা সুগত বুদ্ধ তাঁর এও গয়াশীর্ষে যাত্রাকালে কখন নিরঞ্জনা নদীর পূর্বপাড়ে গিয়েছিলেন তার কোন আভ্যন্তরিণ সাক্ষ্য আমরা পাই না। উরুবেলা যে একে বারে জনহীন এলাকা ছিল না তা সুস্পষ্ট করতে বোধ হয় আর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে না।

(গ) গয়াশীর্ষ সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা ঃ

বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে সঙ্গত কারণেই গয়াশীর্ষ (পর্বত) সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা হতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে বুদ্ধগয়া তথা তদসন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত ডুঙ্গেশ্বরী, সুজাতা কুটি আদি যেসব বৌদ্ধ তীর্থ বর্তমান, তার সাথে গয়াশীর্ষ পর্বতও একটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ তীর্থ। বৌদ্ধগণ সাধারণত গয়াশীর্ষ পর্বতকে হিন্দু তীর্থ (ব্রহ্মযোনি) রূপে মনে করে থাকেন। কিন্তু ঐ গয়াশীর্ষ পর্বত যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থ তার

ইতিহাস আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই এখানে বলাবাহুল্য যে, সারনাথ ও তদ্‌সংলগ্ন অঞ্চলে বুদ্ধ সহ প্রথম একষট্টিজন অরহত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এর অব্যাবহিত পর গয়াশীর্ষ পর্বতে তিন কাশ্যপভ্রাতা সহ তাঁদের অপর এক হাজার শিষ্য বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর অরহত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সঙ্ঘ বিস্তার যে দ্রুতগতি লাভ করে তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। তাই আমি মনে করি বুদ্ধগয়ার অন্যান্য তীর্থস্থলগুলোর মধ্যে গয়াশীর্ষ পর্বতও যে একটি বৌদ্ধ তীর্থ তার প্রচার অধিকাধিক হওয়া প্রয়োজন। যারা বুদ্ধগয়া দর্শনে আসেন তাঁদেরকে এ বিষয় জ্ঞাত করানো এবং গয়াশীর্ষ বৌদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন ও পূজা-সৎকার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

"ভবতু সব্ব মঙ্গলং"

সমাপ্ত